e-পূজাবার্ষিকী ১৪২২

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres

উৎসর্গ ৫০-এ

বহু বছর মিলিয়ে গেছে ভাবনায় আর অন্ধতায়

তবুও আমরা পেরোতে পারিনি বুঝতে পারিনি কিছুই প্রায়

হঠাৎই তাই বদল এনেছে এনেছে ঝড় এক অভিপ্রায়

মিলেছি আমরা শুধুমাত্র মগজাস্ত্রের বন্ধুতায়

ফেলুদা তাই আজও এসেছে মিলিয়েছি হাত একসাথে

চলেছি সবাই মেলামেশা করে চলেছি আমরা এক পথে

ফেলুদা অমর, তাইতো জানাই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা

৫০-এর ঘর পেরিয়ে হামলে পরুক আকাঙ্খা

আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

e-পূজাবার্ষিকী ১৪২২

সম্পাদকীয়

বিশেষ আকর্ষন

বড় গল্প

গল্প

অণু গল্প

প্রবন্ধ

ফেলুদা স্পেশাল

কবিতা

ভ্রমন

তুলির টানে

আলোক চিত্র

প্রচ্ছদ

সৌজন্যে Doodlers

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিজাইন ও ইলাস্ট্রেসানগুলি নেট থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হয়েছে। ইহাদের আর্টিস্ট এবং আপলোডারদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

e-পূজাবার্ষিকী ১৪২২

তৃতীয় বর্ষ, শারদ সংখ্যা

প্রকাশক

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা

ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের মাননীয় সদস্যবৃন্দ, ভাই বোনেরা ও গুরুজনেরা,

শুভ শারদোৎসব ১৪২২। আপনাদের প্রশ্রয়, স্নেহ ও আশীর্বাদকে শিরোধার্য করে আবার আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি আপনাদের আমাদের সবার প্রিয় ফেলুদা ফ্যান ক্লাবের পত্রিকার শারদ সংখ্যা। এই শারদ সংখ্যাও আপনাদের সবার মনোরঞ্জনে সক্ষম হবে এই আশা রাখি।

এই বছর ফেলুদার আবির্ভাবের সুবর্ণ জয়ন্তী। পঞ্চাশ বছর-মানে অর্ধ শতাব্দী।

পঞ্চাশ বছর আগে ফেলুদা যখন গোয়েন্দাগিরি শুরু করেন তখন তার সাথে ছিল শুধু তোপসে। তারপর সোনার কেল্লা থেকে তাদের সঙ্গী হলেন সাহিত্যিক লালমোহন গাঙ্গুলী বা জটায়ু। তারপর এই ত্রিরত্ন কত অভিযানে গেছেন ও কত রহস্যই না ভেদ করেছেন একসাথে। কিন্তু এত বছরেও ফেলুদার আকর্ষন এতটুকুও কমেনি। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাহলেও অন্তত কেটে গেছে তিন পুরুষের সময়। দাদু পড়েছিলেন এক সময় ফেলুদা কাহিনী আর আজ নাতিও পড়ছেন ফেলুদা কাহিনী সমান উৎসাহে। এর পরও এই ফেলুদা কাহিনীকে কালোত্তীর্ণ বলা যায় কি যায় না তার বিচার করবেন পন্ডিতরা। আমরা শুধু জানি যে আমরা এই ত্রিরত্নের প্রশংসক ছিলাম, আছি ও থাকব। ফেলুদা হলেন চির সবুজ তারুণ্যের প্রতীক। ফেলুদা হলেন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সততা ও প্রতিবাদের প্রতীক। ফেলুদা হলেন দুর্দম সাহসের প্রতীক। ফেলুদা হলেন অজানাকে খুঁজে বের করার প্রতীক। তাই তো ফেলুদা এই অর্ধ শতাব্দী ধরে সম্মান ও ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। আর তার সাথে নির্ভুল ভাবে সঙ্গত করে গেছেন তোপসে ও জটায়ু। সময় এদের হারাতে পারেনি। এদের বয়সও তাই বাড়েনি। চারপাশের পরিবর্তনশীল সমাজ ও তার মূল্যবোধ এনাদের প্রাণশক্তি ক্ষয় করতে সক্ষম হয়নি। এরা যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন, আর তেমনই থাকবেন আরও পঞ্চাশ বছর পরেও। জয়তু ত্রিরত্ন।

আশা রাখি যে এবারও আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আপনাদের স্নেহ, ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হবে বরাবরের মতো। আপনাদের মতামত যদি এক লাইন লিখে জানান তাহলে আমরা সবাই কৃতজ্ঞ থাকব। ভুল ত্রুটি যদি কিছু হয় তাহলে দয়া করে আমাদের তা জানালে আমরা নিশ্চয়ই পরের বার সেটা শুধরে নেব। শারদ উৎসবের দিনগুলি আপনাদের সবার ভালো কাটুক। সবাই ভালো থাকুন। বিশ্ব জননী মা দুর্গার আশীর্বাদ আপনাদের সবার উপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে ও সবাইকে নমস্কার, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আজ থামছি। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে নববর্ষ ১৪২৩-এ।

বিনয়াবনত

২৪ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব নিবেদিত
শারদীয়া পত্রিকার
সম্পাদক সম্পাদিকা বৃন্দ

আমার দেখা গ্রামের পথ

মোঃ আঃ মুকতাদির

বুকে বহে জীবনের স্রোত
গ্রামের মাটির পথ আমি,
কখনো বহে আনন্দ প্লাবন
কখনো হই ব্যথার ভূমি।
গ্রীষ্মে আমার ভরা যৌবন
আমি চঞ্চল তরুণ,
আমায় রেখেছো নবীন করে
সালাম তোমায় অরুণ।
বর্ষার দিনে মলিন মুখে
পথিকেরা মাড়ায় কাদা,
বৃষ্টি গালি কম শোনে শুধু
আমায় বলে যা তা।
প্রিয়ার মুখের হাসি দেখে
আমি হই ধন্য,
প্রিয় যে তার আসছে এবার
পথ বেয়ে তার জন্য।
শিশুর উচ্ছল আনন্দেতে
হাসি মেলার দিনে,
পথ বেয়ে তার ফিরছে বাবা
অনেক জিনিস কিনে।
মায়ের কোল ভরবে এবার
ছেলে আসছে ফিরে,
কেউ আসছে বিদেশ হতে
কেউবা ঈদের তরে।
ব্যথায় আমি বড়ই কাতর
পিতার দুঃখে দুখী,
যখন যায় শ্বশুরবাড়ী
ছোটবেলার সেই খুকী।
মনের মাঝে কত স্মৃতি
রাখা আছে গেঁথে,
ইচ্ছা হলে শুনতে পারো
এসো মাটির পথে।

দিকচিহ্নপুর

গৌতম দাস

আমি তো পারিনি, তুমি চেষ্টাও করলে না;
দূর থেকে সরে যাচ্ছ, ক্রমশ আরো দূরে,
সে পথ আমার নয়, সে পথ অচেনা-
তাও ঠিক দেখা হবে একদিন দিকচিহ্নপুরে।

ততদিন বৈচিত্রহীন সময় কাটানো।
সময় না স্থবিরতা! শতাব্দীপ্রাচীন...
আমি না জানতে পারি, তুমিও কি জানো?
কতগুলো রাত শেষে কটা কাটে দিন?

সময় স্বার্থপর, তুমি তা বোঝনা।
গতিশীল স্মৃতি হয়ে আরো দূরগামী;
যেখানে স্তব্ধ সব, যায়নাকো শোনা,
শুধু দূর থেকে দেখা; কতদূর আমি।

তোমার স্বভাবে কিছু কঠিনতা ছিল,
আমিও কঠিন...একা পথ ঘুরে ঘুরে।
মাঝে জমা কিছু প্রেম, কিছুটা বাতিলও;
তাও ঠিক দেখা হবে একদিন...দিকচিহ্নপুরে।

শারদ উৎসবের

আন্তরিক প্রীতি

ও

শুভেচ্ছা

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

না-গোয়েন্দার কারসাজি

অনন্যা দাশ

আমার নাম নিখিলেশ। আমার বন্ধুরা আমাকে নিক বলে ডাকে। আমি কলকাতা থেকে মাস্টার্স করে ইউ.এস.এ. মানে মার্কিন মুলুকে পি.এইচ.ডি. করতে এসেছি। এখানে চেম্বার্সবার্গ টাউনে চেম্বার্সবার্গ কলেজে পড়ি, পড়াই, রিসার্চ করি। কলেজের নিজস্ব থাকার ব্যবস্থা আছে।

সেখানেই আমি আরেকটা ছেলের সঙ্গে শেয়ার করে থাকি। সেই ছেলেটার নাম যযাতি, সবাই তাকে জজ বলে ডাকে। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম প্রথমে যে কী হবে, ওর সঙ্গে পটবে কিনা, কিন্তু ছেলেটা খুব ভাল। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। যযাতি খুব কাজের ছেলে। এখানে অ্যাসোসিয়েশান অফ ইন্ডিয়ান্স ইন চেম্বার্সবার্গের ও প্রেসিডেন্ট। এটা সেটা অনুষ্ঠান করতে থাকে। এই তো আজকেই হোলি করল। যদিও এখন মে মাস তাও। আসলে এখানে মার্চে এত ঠান্ডা থাকে যে ওই সব জলটল দিয়ে হোলি খেলা মোটেই পোষায় না। যযাতি কিন্তু এদেশেই জন্মে বড় হয়েছে। তাও ওর মধ্যে ভারতের প্রতি একটা টান আছে। আসলে ওর দাদু ঠাকুমা এদেশে ওর সঙ্গে ছিলেন এবং ওরাই ওকে মানুষ করেছেন। ওনাদের সঙ্গে যযাতি নাকি প্রতি গরমের ছুটিতে কলকাতা যেত। তিন বছর হল ওনারা গত হয়েছেন তারপর থেকে আর যাওয়া হয় না।

যাই হোক মে মাসে ভালই হইচই করে দোল খেলা হল ইউনিভার্সিটির একটা মাঠে। কাল থেকে তিন দিন লম্বা ছুটি, এখানে বলে লং উইকেন্ড। যযাতির বাড়ি নিউ ইয়র্কে লং আইল্যান্ডে ও সেখানেই যাবে। ওরা বেশ বড়লোক। এই লং উইকেন্ডে বেশির ভাগ স্টুডেন্টরাই যে যার বাড়ি চলে যাবে। ফাঁকা হয়ে যাবে ক্যাম্পাস। আমার বাড়ি তো আর তিনদিনে ঘুরে আসা যায় না তাই আমি থাকব। এই সময়টা বাড়ির জন্যে খুব মন কেমন করে।

হঠাৎ সবুজ আবির আর লালচে স্ট্রবেরি জেলি মাখা (হোলি খেলাতে কে যেন কয়েকটা জেলির শিশিও এনে হাজির করেছিল, মনে হয় রঙিন বলে!) যযাতি আমার সামনে এসে বলল, "যাবি নাকি আজ রাতে আমার সঙ্গে আমার বাড়ি?"

আমি তখন সবে একটা শিঙ্গাড়ায় কামড় দিয়েছি। এখানকার ডাইভার্সিটি ক্লাব থেকে কিছু ডোনেশান যোগাড় করে শিঙ্গাড়া আর মিষ্টিও এনেছে যযাতি। মুখে খাবার থাকলে মুখ হাঁ করে কথা বলতে নেই যযাতিই শিখিয়েছে তাই আমি মুখে কিছু না বলে শুধু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। কেই বা একা একা খালি ক্যাম্পাসে পড়ে থাকতে চায়?

"ঠিক আছে তাহলে সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিস। এখান থেকে সাড়ে চার ঘন্টা মতন লাগে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব। পথে কোথাও নেমে পিজা বা কিছু খেয়ে নিলেই হবে।"

হোলি খেলা শেষ হতে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হল তারপর যে যার বাড়ি মুখো। যযাতিদের টেবিল ইত্যাদি তুলে টুলে দিতে সাহায্য করে আমি এক দৌড়ে বাড়ি। স্নান সেরে রঙ টং ধুয়ে আমি একটা ব্যাগে কয়েকটা জামাকাপড় নিয়ে নিলাম। একটু পরে যযাতিও এসে স্নান করতে ঢুকল। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা নাগাদ রওনা দিলাম আমরা।

যযাতি বড়লোকের ছেলে, ওর গাড়িটা বেশ ভাল। নতুন হুন্ডাই সোনাটা, গাঢ় নীল রঙের। ভিতরে চামড়ার সীট, জি.পি.এস.। ওর কাছেই শুনলাম ওর জেঠুর একটা কেমিকাল কম্পানি আছে। জেঠুই সেটার প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওর এক কাকাও সেখানে কাজ করেন। ওই কাকা বিয়ে টিয়ে করেননি। জেঠুর এক ছেলে এক মেয়ে। জেঠিমা আর যযাতির মা-বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন একটা গাড়ির দুর্ঘটনায়। এখন বাড়িতে শুধু জেঠু আর কাকা থাকেন আর কাজের লোক মঙ্গলামাসি আর জগমোহন। ওরাই ঘরদোর দেখাশোনা রান্না বান্না ইত্যাদি করে। যযাতি আর ওর জেঠুর ছেলেমেয়ে মানে সুমিদি আর ঋষি মাঝে মাঝে যায়। মঙ্গলামসি নাকি দারুণ রান্না করে। কাল থেকে জমাটি খাওয়া দাওয়া হবে সেই আনন্দে আমার মনটা নাচছিল। তখন কী ছাই জানতাম যে কপালে অন্য কিছু লেখা আছে!

রাস্তায় ডমিনোস থেকে পিজা তুলে খেয়ে আমরা সাড়ে এগারটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম। সবাই শুয়ে পড়েছে তখন বলে আর কারো সঙ্গে দেখা হল না। যযাতির কাছে বাড়ির চাবি ছিল, তাই দিয়ে দরজা খুলে ঢুকলাম আমরা। আমাকে দোতলায় একটা গেস্ট রুম দেখিয়ে দিয়ে ও নিজের ঘরে চলে গেল। আমিও জামা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যযাতির বাড়ি দেখে আমি তো থ! এই বাড়ির ছেলে কী করে আমার সঙ্গে ওই ছোটো অ্যাপার্টমেন্টে থাকে? বিশাল বাড়ি ওদের, তাতে গেস্ট রুমটুম নিয়ে প্রায় ১৫টা শোওয়ার ঘর! আর বেশ ক'টা ঘরের জানালা দিয়েই দেখা যায় সমুদ্র! ওদের নিজস্ব একটা বিচ আছে!

যযতির কাজিনরা তখনও এসে পৌঁছোয়নি তাই তাদের কারো সঙ্গে দেখা হল না। ওর জেঠু শনিবার দিনও খুব ভোরে উঠে কাজে চলে গেছেন। কেবল ওর কাকার সঙ্গে দেখা হল। আমরা যখন নামলাম তখন প্রায় দশটা বাজে। উনি ডাইনিং রুমে জলখাবার খাচ্ছিলেন। শুধু শুকনো টোস্ট

আর কালো কফি! আমাদের দেখে হাতের খবরের কাগজটা নামিয়ে রেখে বললেন, "আরে ভুলু, এসে গেছিস! কাল কখন পৌঁছলি?"

যযাতির ডাক নাম যে ভুলু সেটা আমার জানা ছিল না! আমি হাসি চাপতে চেষ্টা করলাম।

যযাতি বেশ রাগি রাগি মুখ করে বলল, "রাত সাড়ে এগারটায় এসেছি কাল। এই হল আমার বন্ধু নিখিলেশ, নিক। আমি ওর সঙ্গে শেয়ার করে থাকি। নিক, এই হল আমার কাকাবাবু।"

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে এক ঝলক দেখে বললেন, "নাও, নাও তোমরা ব্রেকফাস্ট করে নাও। আমি চট করে একবার অফিসে ঢুঁ মেরে আসি। রাতে দেখা হবে। লালু আর সুমিও আজ আসছে। রাতে খাবার টেবিলে সবার সঙ্গে দেখা হবে", বলে কেমন যেন ব্যস্ত হয়েই বেরিয়ে গেলেন। টোস্ট আর কফি আধ-খাওয়াই রয়ে গেল!

সেদিন সকালটা ভালই কাটল আমার আর যযাতির (ওকে ভুলু বলে ডাকলে ও আর আমার সঙ্গে কোনদিন কথা বলবে না বলে দিয়েছে)। প্রথমে ওর জেঠুর ফ্যাকটরিটা দেখাতে নিয়ে গেল যযাতি। যদিও ওর জেঠু বা কাকা কাউকেই দেখলাম না। ওনারা নাকি মিটিঙয়ে আছেন বলে। সেখান থেকে ফিরে ওদের বাড়ির লাগোয়া বিচে গিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটলাম। যদিও এখনও এখানে জল বেশ ঠান্ডা। বাড়ি ফিরে দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় যযাতি এসে বলল, "এই তৈরি হয়ে নে। আমাদের এখানে খাওয়া ঠিক আটটায়। দেরি হলে জেঠু খুব রেগে যান। আর ফুল হাতা জামা আর ফুল প্যান্ট পরিস। খাবার টেবিলে হাফ প্যান্ট বা বার্মুডা পরা জেঠু পছন্দ করেন না!"

ভাগ্যিস আমি ফুল শার্ট আর প্যান্ট এনেছিলাম সঙ্গে করে, নাহলে যযাতির কাছে ধার নিতে হত। কাঁটায় কাঁটায় আটটায় নিচে নেমে ডাইনিং রুমে গেলাম। তখন সবাই এসে গেছে। যযাতির দিদি আর ভাই লালুর (থুড়ি ঋষি, সেও লালু বললে উত্তর দেয় না!) সঙ্গে আলাপ হল। খাবার ঘরে ঢুকে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! ঝাড়লন্ঠনগুলো জ্বলছে, টেবিলে ধবধবে সাদা টেবিলক্লথ পাতা, বাহারি কাচের প্লেট, ঝকঝকে ছুরি, চামচ, কাঁটা। অন্য একটা টেবিলে লাইন দিয়ে প্রচুর খাবার। মাছ, মাংস, ডিম কিছুই বাদ নেই। মঙ্গলামাসি দারুণ সব রান্না করেছে। কত দিন এই সব খাবার খাইনি! টেবিলের এক দিকে যাকে বলে 'হেড অফ দা টেবিল' যযাতির জেঠু বসলেন আর আমরা বাকি দু দিক ধরে। যযাতির জেঠু খুব রাশভারি চেহারার। গমগম করা গলার স্বর! যযাতি, ঋষি আর সুমি কি সব নিয়ে হাসাহসি করছিল খেতে খেতে, হঠাৎ জেঠু বলে উঠলেন, "শোনো লালু, ভুলু, সুমি। তোমাদের সবাইকে একটা কথা আমি বলতে চাই। প্রথমে ভেবেছিলাম খাওয়ার পর বলব কিন্তু এখন মনে হল শুভস্য শীঘ্রম। খবরটা চেপে রাখার কোন

মানে হয় না।” এতটা বলে সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, “আমি আমার উইলটা বদল করব ঠিক করেছি। কাল উকিল আসবে। আমার কম্পানি হালদার অ্যান্ড সন্স আর আমার বাকি যা কিছু আছে মানে এই বাড়ি তার আসবাব পত্র ইত্যাদি সব আমি আমার গুরুদেব শ্রী নিত্যানন্দজি মহারাজকে দিয়ে দেব ঠিক করেছি। ওনারা একটা মন্দির করতে চান এবং তার জন্যে অর্থের প্রয়োজন হবে। আমিও সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ওখানেই চলে যাব ভাবছি। ওখানে গেলে আমি মনে শান্তি পাই। আর তোমরা তো আমাকে অশান্তি ছাড়া কিছুই দাও না!”

আমি টেবিলের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। যযাতির মুখ হাঁ! ঋষির মুখ মাছের মতন খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে! সুমিদির হাত থেকে চামচ পড়ে গেছে কার্পেটে অথচ তার খেয়াল নেই।

যযাতি যে আমাকে খাবার মুখে নিয়ে কথা বলতে বারণ করে সেই বিষয়ে বড়সড় লেকচার দিয়েছিল, সে সব কিছু ভুলে গিয়ে এক মুখ ভর্তি খাবার নিয়েই হাঁউহাঁউ করে বলল, “তুমি মজা করছ!”

“মোটেই না!” গমগম করে উঠল জেঠুর গলা, “মজা আমি করি না তা তুমি ভালই জানো! তোমাদের কিছু টাকা দিয়ে যাব, একেবারে কানাকড়িও পাবে না তেমন নয়, কিন্তু যে রকমটা ভেবেছিলে তার ধারে কাছেও নয় সেটা। কারণ তোমরা এত দিন ধরে শুধু আমার টাকা ধ্বংস করেছ! এই কম্পানিটাকে আমি নিজের হাতে গড়েছি তাই আমার অধিকার আছে সেটাকে নিয়ে যা খুশি করার। তোমরা সবাই জোঁকের মতন আমার রক্ত শুষে খেয়েছ এতদিন। আমার পকেট হাল্কা করা ছাড়া তোমাদের আর কোন কাজ নেই যেন! এবার নিজেরা নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে যা পারবে তাই করে খাবে।”

আমি বুঝলাম এটা একটা ভয়ানক ঘটনা। যযাতি যদি জানত জেঠু এই রকম একটা ঘোষণা করবেন তাহলে সে মোটেই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসত না। ঘরে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা। শুধু জেঠু কথাগুলো বলে নির্বিকার ভাবে খেয়ে চলেছেন! সুমিদি কাঁটা দিয়ে খাবারগুলোকে টেনে টেনে প্লেটের চারিদিকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। কাকা কাপড়ের ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছছেন। আর মনে হয় খেতে পারবেন না। যযাতি আর ঋষি বোম্ হয়ে বসে আছে। আমার মনে হচ্ছিল আমি কিছু চিবুলেই সেই শব্দটা নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দেবে তাই খাবার চিবুতেও ভয় পাচ্ছিলাম! এদিকে জেঠু স্বাভাবিক ভাবে খেয়ে চলেছেন। কাটগ্লাসের গেলাস থেকে জল খেলেন। কাঁটাচামচ দিয়ে মাংস কেটে কেটে মুখে পুরছেন। বাকিরা সবাই খাওয়ার অভিনয় ছেড়ে হাঁ করে জেঠুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে জেঠু সাংঘাতিক ভাবে বিষম খেলেন। কাশতে কাশতে উনি খাবার প্লেটের ওপর মাথা রেখে স্থির হয়ে গেলেন। আমরা হতভম্ব, ওনার কী হার্ট অ্যাটাক হল নাকি? আমি ছুটে গিয়ে ওনার পালস দেখতে চেষ্টা করলাম। নাহ, মনে হয় সব শেষ! ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আমরা কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যযাতি নিজেকে সামলে নিয়ে নিজের মোবাইল থেকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকার জন্যে ফোন করল।

(২)

সেদিন রাতে যা হবার তো হল। পরদিন সকালে পুলিশ ডিটেকটিভ এসে আমাদের সবাইকে জেরা করতে শুরু করল। ওদের মেডিকাল একজামিনার নাকি সব দেখেশুনে বলেছেন যে হার্ট অ্যাটাক মোটেই নয়, বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে যযাতির জেঠুর। সেটা শুনে আমি বেশ আশ্চর্য হলাম। বিষ আবার কোথা থেকে এল? যা খাবার সব তো বাসন ধরে ধরে রাখা ছিল বুফের মতন। আমরা সবাই তো তার থেকেই নিচ্ছিলাম। অন্য কারো তো কিছু হয়নি! কারো জন্যে তো খাবার আলাদা করে বেড়ে দেওয়া হয়নি। জলও সবাই এক জগ থেকেই নিচ্ছিলাম।

পুলিশ সব খাবারের স্যাম্পেল নিয়েছে কিন্তু সেই সব রেজাল্ট আসতে তো সময় লাগবে। তাছাড়া সোমবার তো মেমোরিয়াল ডের জন্যে ছুটি।

পুলিশ ডিটেকটিভ মিস্টার হ্যারিসন বললেন, “সময় হয়তো লাগবে কিন্তু সব রেজাল্ট আমরা পেয়ে যাব। অন্যরা কেউ অসুস্থ হয়নি মানে খাবারে কিছু ছিল না। আপনাদের কেমিকাল ফ্যাকট্রি তাই আপনাদের পক্ষে বিষ পাওয়াটা অসুবিধের কিছু না, সেখানে তো হরেক রকমের বিষ নিয়ে কাজ হয়। ফ্যাকটরিতে আজ কে কে গিয়েছিলেন?”

আমি আর যযাতি মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। যযাতি বলল, “হ্যাঁ, আমরা গিয়েছিলাম। আমি নিককে জেঠুর

ফ্যাকটরিটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওটাকে আমি সব সময় আমাদের ফ্যাকটারি বলেই ভেবেছি...।"

সুমিদি বলল, "আমি আর লালু আসার পথে ওখানে ঢুঁ মেরেছিলাম বাবার সঙ্গে দেখা করব বলে কিন্তু দেখা পাইনি। বাবা মিটিঙয়ে ছিলেন।"

ঋষি ঝাঁঝিয়ে উঠল, "মিথ্যে কথা বলিস না! বাবার কাছে টাকার দরকার ছিল তাই তুই ওখানে গিয়েছিলি! বাড়িতে সবার সামনে টাকা চাইতে লজ্জা লাগে বুঝি?"

সেই শুনে সুমিদি গর্জে উঠল, "হ্যাঁ, তুই যেন ধোওয়া তুলসিপাতা! কতবার এটা পড়ব সেটা পড়ব করে কোর্স করতে নিয়ে মাঝপথে ছেড়েছিস ভাল লাগেনি বলে আর কত অজস্র টাকা নষ্ট করেছিস সেটার খেয়াল আছে? একমাস আগেও তুই একা একা এসে বাবার কাছে টাকা নিয়ে গেছিস সেটা আমি জানি না ভাবছিস!"

ঋষি গজগজ করল, "আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আর মেকানিকটা বলল ৩০০০ লাগবে সারাতে! ভুলু কেমন নতুন গাড়ি চালাচ্ছে আর আমি এখনও সেই ১৫ বছরের পুরনো ঝরঝরে গাড়িটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি।"

যযাতিও রেগে গেল এবার, "জেঠু আমাকে নিজের থেকে গাড়িটা কিনে দিয়েছেন আমি পি.এইচ.ডি. তে চান্স পাওয়ার পর! আমি তো চাইনি।"

"হ্যাঁ, চাসনিই বটে দিন রাত ঘ্যানর ঘ্যানর করে গেছিস!"

"আহ কী হচ্ছেটা কী তোমাদের!" যযাতির কাকু বলে উঠলেন, "নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছ কেন? ফ্যাকটরিতে আমরা সবাই যাই বা গিয়েছিলাম। কেন কিসের জন্যে সেটা অমূলক! হয়তো দাদা ফ্যাকটরিতে কিছু খেয়েছিলেন ভুল করে।"

"নাহ" মিস্টার হ্যারিস বললেন, "ওনার সিমটম আর দেহের অবস্থা দেখে যে বিষের কথা সন্দেহ করেছেন আমাদের এম.ই. সেটা কুড়ি মিনিট থেকে আধ ঘন্টার মধ্যে কাজ করে। তাই মারা যাওয়ার আধ ঘন্টা আগের কিছু থেকেই ওনার মৃত্যু হয়েছে।"

"কিন্তু আমরা তো সবাই এক সঙ্গে খেয়েছি!" সুমিদি আবার বলল।

"হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আপনার বাবার খাবার টেবিলের ওই ঘোষণাটার পর নিক ছাড়া আপনাদের সবার মোটিভ রয়েছে ওনাকে মারার। অতগুলো টাকা আর ওনার সব সম্পত্তি কিনা কোন এক সাধুবাবার আশ্রমে চলে যাবে সেটা তো আপনারা ভাল মনে মেনে নিতে পারছিলেন না!"

সুমিদি মুখ বেঁকিয়ে বলল, "আমার টাকার মোটেই দরকার নেই। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রিটা পেয়ে যাব, তারপর মোটা মাইনের চাকরি পেতে আমার অসুবিধা হবে না।"

"হ্যাঁ, অতই যদি সহজ হত তাহলে এত দিন ভ্যাগাবন্ডের মতন ঘুরছিস কেন? লতায় পাতায় বয়স তো তোর কম হল না! যে চাকরিটা পেয়েছিলি সেটাই ধরে রাখতে পারলি না! তোর মতন বদমেজাজিকে কে চাকরি দেবে?"

"আর তুই যে ব্লু মনসুনে জুয়া খেলতে যাস প্রতি শুক্রবার সে খবর বাবা পেয়েছিলেন তুই জানিস? বাবার সম্পত্তি সব পাবি এই ভরসাতেই তো উলটো পালটা বাজি ধরে বসে আছিস! আর ওই ভুলুরও তো ফান্টুসির শেষ নেই! প্রতি মাসে নিজের স্টাইপেন্ডে ওর মোটেই চলত না। বাবা ওকে মোটা হাত খরচ পাঠাতেন।"

যযাতিও ছাড়বে না, "শুধু কী আমাকে? তোমাদের দুজনকেও টাকা পাঠাতেন আমি জানি! তোমরা লুকোবার চেষ্টা করলে চলবে না! জেঠুর ব্যাঙ্ক থেকে খোঁজ করলেই রেকর্ড পাওয়া যাবে!"

পুলিশ ডিটেকটিভ ওদের ওই ঝগড়া খুব উপভোগ করছিলেন। আমার মনে হল সব টেপও করছিলেন হয়তো।

ওদের কাকা আবার বাধা দিলেন, "কেন ঝগড়া করছ তোমরা? দাদার আত্মা কী এতে শান্তি পাবে? উনি তো তোমাদের এই ব্যবহার দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে মনের শান্তির জন্যেই সব করছিলেন। আচ্ছা মিস্টার হ্যারিস, ওই বাবাজি? তিনি এর জন্যে দায়ি নন তো? কাল বিকেলেও অফিস ফেরত দাদা কিন্তু ওখানে গিয়েছিলেন!"

পুলিশ ডিটেকটিভ মাথা নাড়লেন, "নাহ, আমরা খোঁজ নিয়েছি। আপনার দাদা ওখানে বিকেল পাঁচটা নাগাদ গিয়েছিলেন। গুরুজির সঙ্গে ওনার বেশিক্ষণ কথা হয়নি কারণ আরো কিছু লোক অপেক্ষা করছিল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে আসেন উনি। বিষটা অত আগে দেওয়া হয়নি। আর সব চেয়ে বড় কথা হল বাবাজির ওখানে কেউ জানত না যে উনি উইল বদল করে সব কিছু আশ্রমের নামে লিখে দিতে চলেছেন। উনি বলেননি সেটা ওদের। তাই ওদের কোন মোটিভ নেই।

ওনাকে বাঁচিয়ে রাখাতেই ওদের সুবিধা কারণ উনি প্রায় রোজই বেশ ভাল প্রণামী দিতেন এবং উইল বদল করে সম্পত্তিও লিখে দিতেন! যাই হোক আপনারা আপাতত কেউ কোথাও যাবেন না। আমি আবার কাল আসব।” বলে উনি সেদিনের মত চলে গেলেন।

বাড়িতে আবহাওয়া খুব একটা সুবিধের নয় দেখে আমি নিজের গেস্টরুমেই বসেছিলাম। যদি খুনের রহস্যের তাড়াতাড়ি সমাধান না হয় তা হলে কলেজে ফিরতে পারব না। কাজের ক্ষতি হবে এই সব ভেবে টেনশান করছিলাম। ভাবছিলাম পুলিশকে বলে আমি বাস ধরে চলে যাব। আমার তো যযাতির জেঠুকে খুন করার কোন মোটিভ নেই!

হঠাৎ আমার মাথায় একটা কথা বিদ্যুতের মতন খেলে গেল। আমি ছুটে গিয়ে যযাতির ঘরের দরজা ধাক্কা দিলাম। ও শুকনো মুখে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে? কিছু চাই?”

আমি বললাম, “আমার মনে হয় আমি জানি কী হয়েছে!”

ওর চোখ গোলগোল হয়ে গেল, বলল, “কী?”

আমি বললাম, “তোর জেঠু যখন কাল ঘোষণাটা করলেন তখন মনে কর উনি বলেছিলেন লালু, ভুলু, সুমি তোমাদের একটা কথা বলতে চাই” মানে শুধু তোদের। তার মানে কাকু আগে থেকেই জানতেন ওনার ওই পরিকল্পনার কথা! তোরা তিনজন যখন জানতিসই না তখন কেন সঙ্গে করে বিষ নিয়ে ঘুরবি? খালি জলের গেলাসগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন কাকু খেতে বসার আগে সেটা আমি দেখেছি। গেলাস আর প্লেটগুলো তো যে যার জায়গায় দেওয়া ছিল। আর হেড অফ দা টেবিলে তো জেঠুই বসেন তাই না? তখনই মনে হয় জেঠুর জলের গেলাসে বিষের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিলেন উনি! তাই অন্য কারো কিছু হয়নি! বিষটা গেলাসে ছিল!”

“খবরদার কেউ নড়বে না!”

ওমা! দরজায় কাকু! হাতে রিভলভার!

“নড়লেই খুলি ফুটো করে দেব! আমি চাকরের মতন এতদিন কাজ করলাম আর দাদা ওই ভন্ড সন্ন্যাসীর খপ্পরে পড়ে সব কিছু তাকে দেওয়ার প্ল্যান করে বসলেন! মগের মুলুক নাকি! আর তোমরা একদম নড়বে না! একটা খুনের যা শাস্তি তিনটে খুনের জন্যে তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না, তাই তোমাদের মতন কেঁচোদের মারতে আমার হাত একটুও কাঁপবে না! বডি সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব আর সবাইকে বলব তোমরা ভয়ে পালিয়েছো।”

আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম! আমি তো জন্মে কোনদিন রিভলভার চোখে দেখিনি আর এবার নাকি খুলিতে গুলি খেতে হবে! এ আবার কোথায় ফেঁসে গেলাম আমি! মা-বাবা বোনটি কাউকে আর দেখতে পাব না কোনদিন! কী কুক্ষণেই যে যযাতির সঙ্গে এই বাড়িতে এসে ঢুকেছিলাম, বেঘোরে প্রাণটা যাবে! ভয়ে আমার বুক ঢিপঢিপ করছে।

হঠাৎ আমরা দেখলাম একটা বড় কাচের ফুলদানি উপরে উঠল আর ধাঁই করে কাকুর মাথার ওপর নেমে এল! কাটা গাছের মতন লুটিয়ে পড়লেন তিনি! বীরদর্পে মঙ্গলামসি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল! বাবা-মা হারা যযাতিকে সেই কোন ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে সে। তার কোন ক্ষতি হচ্ছে দেখলে মঙ্গলামাসির মাথায় খুন চেপে যায়, তখন সে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে!

* * *

এর পর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল যযাতি কারণ জেঠুর আগের উইলের অনুযায়ী কম্পানি, বাড়ি, সব কিছু ওরা তিন ভাই বোন সমান ভাবে পেয়েছিল (কাকুও এক অংশ পেতেন কিন্তু উনি তো যাবজ্জীবন জেলে কাটাবেন সেই জন্যে তিন ভাগ)। যযাতি তাই এখন কম্পানির সি.ই.ও. হয়ে বসে আছে। ওদের ওই সমুদ্রর ধারের বাড়িটায় আমার খোলা আমন্ত্রণ আছে। যদিও আমার আর ওখানে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে নেই। ওখানে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটাকে তো আর ঠিক আনন্দের বলা যায় না। ওদের ওখানকার স্থানীয় কাগজে আমার নাম বেরিয়েছিল। সেই কাটিংটা মা-বাবাকে পাঠিয়েছি। ওনারা সেটাকে বাঁধিয়ে আমাদের কলকাতার ফ্ল্যাটে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন আর যেই আসে বাড়িতে তাকে দেখান! শুনে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে! ছিঃ, আমি কী গোয়েন্দা নাকি! আমি তো শুধু যযাতির জেঠুর কথাগুলো থেকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে সেও বুঝত, তাই না?♦♦♦

চিত্রগ্রাহক: সাখাওয়াত ইসলাম

গ্রাম বাংলার আরেক অপু

শরতের সূর্যাস্ত

আমি চলি পাতায় পাতায়

শরৎ এলো একী?

বাণী চক্রবর্তী

হঠাৎ সেদিন টি.ভি. খুলে দেখি,
শরৎ এলো একী?
কেমন করে? কেমন করে আবার;
দেখছ নাকি টিভির মাঝে কাশফুলেরই বাহার?
শিউলি ফুলের আল্পনা যে আঙ্গিনারই পরে,
মায়ের বোধন হচ্ছে কেমন অনেক যত্ন করে।
বাজছে শাঁখ, দিচ্ছে উলু টি.ভি. রমণীরা,
বাদ্যি বাজে, ঘন্টা বাজে আর বাজে নাকাড়া।
চ্যানেল জুড়ে চলছে নানা বিকিকিনির মেলা,
শরৎ রানীর উৎসবেতে টি.ভি. মাতোয়ারা।
ভাবনা কিছু নেই,
আসছি আসছি বলছে শরৎ, আর তো দেরী নেই।
আসছি বলে শিউলিরা সব জানান দিয়ে যায়,
মূর্তিপাড়ার মূর্তিরাও আসার প্রতীক্ষায়।
কাশফুলেরই দেখা পাওয়া একটুখানি ভার,
শহর ছেড়ে যেতে হবে গ্রামে গঞ্জের ধার।
বছর জুড়ে আছেই তো ভাই নানা কেনাকাটি,
ভীড়ভাট্টা হতে এখনো আর কিছুটা বাকী।
প্রকৃতিরই রাজ্যে শরৎ প্রায় তো এসেই গেলো,
খুশীর বার্তা টি.ভি. নাহয় খানিক আগেই দিলো।

শূন্য বেলার উপাখ্যানে

দীপাঞ্জনা সাহা

তুমি ভোরের আকাশে শেষ রাতের
গন্ধ মাখা ধূসর বস্ত্র,
আঁধারের খাঁচে খাঁচে ভেসে ওঠা
তুমি ঘাসের আড়ালে, শিশির জলে
স্নান শেষে হলুদ টিকা পরো,
হাজার তরুণীর সূর্য ভাঙা উজ্জ্বল হাসিতে
তুমি ভেসে যাও, ছোটবেলায় সমুদ্রে
হারানো নূপুরের মতো দূরত্বে-

রাস্তার ধারের সঙ্গে বেগুনী ফুলে
রঙিন হাসি, দু-তিন যুগ বাদে
ফিরে আসা পূর্বজন্মের প্রেমিক দামাল রূপ,
তুমি দেখনি-
তুমি দেখনি ফিরে সেই দামাল রূপ,
আজ রক্তাক্ত শরীরে কি-বা পারি দিতে?
তোমার আর্জি আজ, ভালবাসার ওপারে-

আজ পড়ন্ত বিকেলে, শব্দ শেষে, শরীর ছাড়া শ্বাস
নির্বাক জলে ঢিল ছোড়ে,
সহস্র দিগন্ত ভেদ করা বজ্র মুহূর্ত নিশ্চুপ!
আগুনের শিখা বের পড়ে সমুদ্রে ফিরে তাকায়,
আকাশ, তোমার টানে আজ ফেরত আসে,
শূন্য বেলার উপাখ্যানে-

জাতিস্মর

চিরন্তন ভট্টাচার্য্য

ট্রেনটা কোথায় একটা এসে থেমেছে। ঘড়ির সময় অনুযায়ী সকাল হয়ে গেছে। ঘুম আগেই ভেঙে গিয়েছিল। মোবাইল খুলে একটা মেল পড়ছিল ইন্দ্রাণী।

“কোথায় এলো দেখ তো ইন্দ্রাণী, স্টেশনের নামটা পড়তে পারছ?” ওপরের বার্থ থেকে সুতনু ঘুম জড়ানো গলাতেই জিজ্ঞাসা করল। ইন্দ্রাণী হাত দিয়ে পর্দাটা সরিয়ে জায়গাটা চেনার চেষ্টা করল। কোনও স্টেশন নয়, সামনে মাঠ, কুয়াশার চাদরে পুরোপুরি মোড়া, প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সকালবেলাতেই একটু লেগ পুলিং-এর ইচ্ছেটাকে ছাড়তে পারলো না ইন্দ্রাণী, “রাজধানী এক্সপ্রেসও তো দেখি আপনার আমতা লোকাল হয়ে গেল সুতনুদা! একেই বলে ব্যক্তি মাহাত্ম্য! কোনও স্টেশন নেই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।”

মেইলে শুভঙ্কর একটা ছবি পাঠিয়েছে, নরওয়ের অসলোতে ওর বর্তমান ঠিকানার পাশের রাস্তাটায় একটা কনিফার বরফে বরফে সাদা কিন্তু সবুজের একটা আভা তাও দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে যে গাছটা শ্যামলিমা একটুও

হারায়নি এই প্রচণ্ড শীতেও! এবং তার সাথে যোগ করেছে যে শুভঙ্করের অবস্থা কিন্তু মোটেও ওই গাছটার মতো নয়, সে বিরহের তুষারে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে আছে। আবছা একটা হাসি নক্ষত্রের মতো ফুটে উঠল ইন্দ্রাণীর মুখে। হঠাৎ করে কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল, 'কুব্ কুব্'! আশ্চর্য! এই বন্ধ কামরায় পাখির ডাক কোথা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই কারো মোবাইলে রিংটোনের শব্দ! আর ঠিক তখনই উইণ্ডো কাচের মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রাণী দেখতে পেল রেললাইনের গা ঘেঁসে কুয়াশায় মুড়তে মুড়তে মাঠের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে একটা মানুষ। মানুষটা যেন খুব চেনা। অস্ফুট একটা আওয়াজ, "সুজয়", বেরিয়ে আসার আগেই আবার গলাতেই আটকে গেল। অফিসের পুরো গ্রুপটা আজ একসাথে রয়েছে, দেরাদুনে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছিল। দেরাদুন থেকে দিল্লী, সেখান থেকে রাজধানী ধরে ফিরে আসা।

কাঁধে একটা আলতো ছোঁয়া পেয়ে ফিরে তাকাতে দেখল শ্রীজা কখন উঠে এসেছে, "কীরে তোর কি এই জায়গাটা নরওয়ে মনে হচ্ছে না কি?"

"যদি সত্যিই তাই হতো!", ঠোঁট ওলটায় ইন্দ্রাণী, "দূর দূর! কখন বাড়ি পৌঁছব বল তো?"

"তুই আরামসে নরওয়েবাসীর ধ্যান করতে পারিস! কম সে কম দু'ঘণ্টা লেট রান করছে! সাড়ে এগারোটার আগে হাওড়া ঢোকার চান্স নেই!"

কিন্তু সুজয় এখানে কোথা থেকে আসবে? আর যদি আসেও আজ এত বছর এত অল্প চেনা একটা মুখ ইন্দ্রাণীর পক্ষে সম্ভবই নয় চেনা। ইন্দ্রাণীর তো প্রায় গত জন্মের কথা বলে মনে হয়। সেই শান্তিনিকেতনে 'সংস্কৃতি পরিবার', অখিলেশ নিয়োগী, মিষ্টিদি, সুচন্দ্রাদি, দেবাঞ্জনদা, রুদ্রনাথ, ঝর্ণা আরও বেশ কয়েকজন। মুখগুলোই এখন ঝাপসা হয়ে গেছে ।অনেকের নামই আর মনে পড়ে না। তার মাঝে সুজয়! ওখানকার লোকাল ছেলে, কোন একটা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়াত, চেহারাতে বা স্বভাবে কোথাও কিছু আহামরি কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না যে আলাদা করে মনে রাখবে। তবুও কি করে বারবার আবছা একটা অবয়ব কুয়াশার ভিতরে হারিয়ে যায় আর তখনই এই একটা নাম মনে ভেসে ওঠে। এই প্রশ্নের জবাব ইন্দ্রাণী নিজেই জানে না।

ফিল্মের প্রোডিউসার অখিলেশ নিয়োগীর হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছিল বাংলা সংস্কৃতি সাহিত্য নিয়ে কিছু একটা করবে। এই অখিলেশ নিয়োগী একটি বেশ রঙিন ধরনের মানুষ। একবার তো ইন্দ্রাণীকে তার কোন ফিল্মে নায়িকা হবার প্রস্তাবও করে বসেছিলেন অবশ্য সেদিন ভদ্রলোক অতি তরল অবস্থায় ছিলেন। সে এক এম্ব্যারাসিং অবস্থা। পাতলা গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে চেহারাটি বেশ ভালো। পঞ্চাশ বছর বয়সটাকে অনেকটাই ঢেকে রাখতে সফল। ফিল্ম প্রোডিউসার হিসেবে নিয়োগী খুব যে সফল তা নয় তবে পরিচিতি বেশ ভালোই। নিয়োগীর আর একটা ব্যবসা আছে সেটা হল তেল মিল-এর। 'রজনীগন্ধা' ব্র্যান্ডের সরষের তেল বাজারে বেশ পরিচিত। ব্যবসাটা ওর শ্বশুরবাড়ির থেকে প্রাপ্ত। এই ব্যবসাটা ওর বৌয়ের নামে চলে তাই সেটা নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না। বোধহয় বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে তেলের ব্যবসা খাপ খায় না বলে! তবে ওর মূল রোজগারটা ওই তেলের ব্যবসা থেকেই আসে, তাই নিয়েই এত বাড়বাড়ন্ত। নিয়োগীর উদ্যোগে সাত দিন ধরে শান্তিনিকেতনে সাহিত্য ক্যাম্প আর শেষদিনে একটা জমকালো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিদিন শান্তিনিকেতন পোস্ট অফিসের সামনে একটা সাংস্কৃতিক জটলা হত। তাতে ওখানকার স্থানীয় বিশিষ্টরাও যেমন থাকতেন তেমনি বোলপুরের আশেপাশের গ্রামগুলো থেকেও অনেকে আসতেন। সেটাই ক্যাম্প। আড্ডা আর আলোচনা ছিল মূল আকর্ষণ। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে নিয়োগী প্রায় কলকাতার সমস্ত ফিল্মজগৎটাকেই তুলে আনতে চেয়েছিল কিন্তু তার দু'দিন বাদেই কিছু একটা উপলক্ষে বিশ্বভারতীতে রাষ্ট্রপতির আসার কথা থাকায় পুলিস ওই রকম বড় একটা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি। শান্তিনিকেতনে নিয়োগীর বিশাল বাড়ি– প্যালেস বললেই ভাল। সেখানেই ওদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। প্রান্তিক-এর দিকে যেতে শ্যামবাটির খালের ওপর যে পুলটা তার কাছেই রাস্তার ওপরে বাড়ি। শুধু অনুষ্ঠানের দিন আরও অনেক লোক আসার কথা ছিল বলে পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসটা বুক করা হয়েছিল। ইন্দ্রাণী যে কি করে সেখানে জুটে পড়েছিল সে নিজেই জানত না। মিষ্টিদি ওদের পাড়াতেই থাকে, বেশ আলাপী আর আন্তরিক বলে আলাদা করে ভাব জমে উঠেছিল। মিষ্টিদি যে বাংলা সাহিত্য খুব চর্চা করে তা নয় তবে নিয়োগীর পরিচিত। বন্ধুর মতো। মিষ্টিদি ওকে
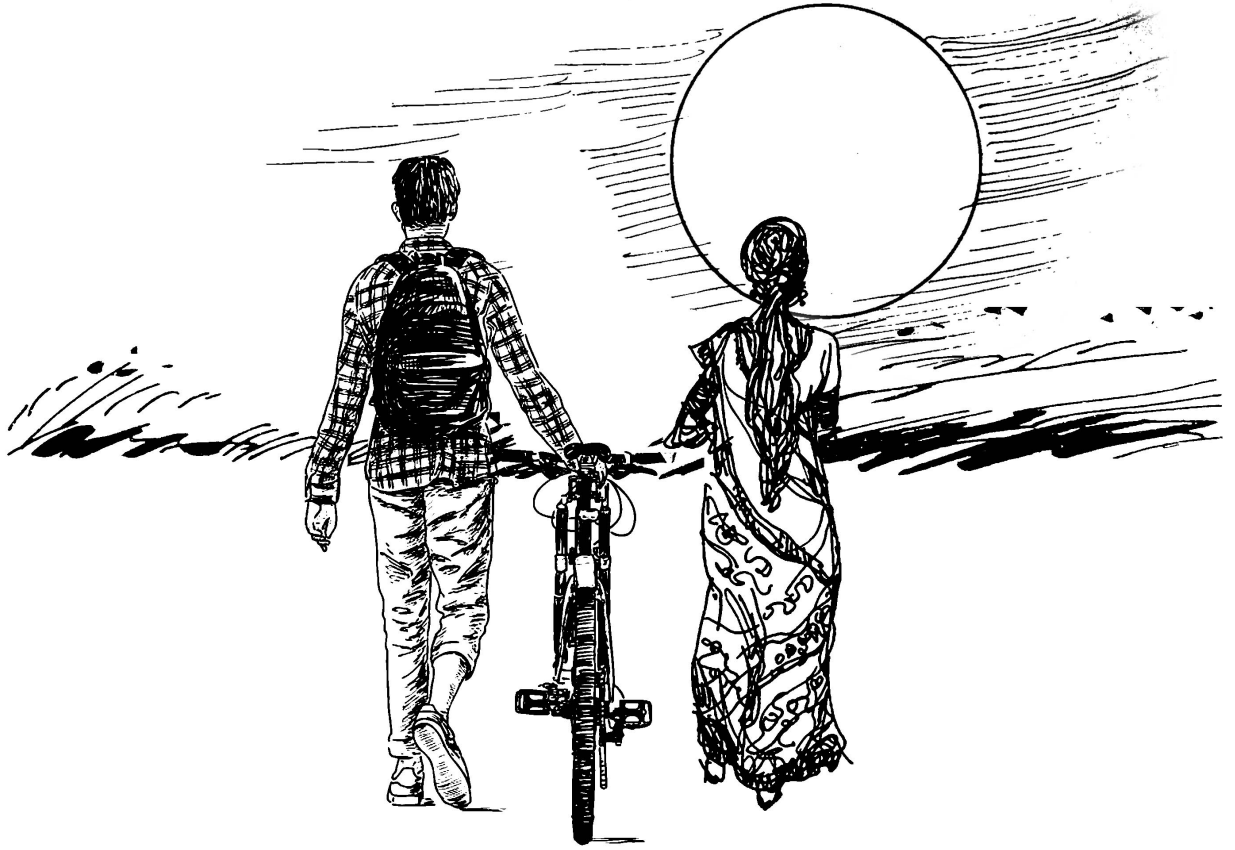
যেতে বলল, আর ও কোনও কিছু না ভেবেই চলল। তখন ওর জীবনটা এইরকমই ছিল। কোনও জায়গায় স্থির নেই। কোনও লক্ষ্য নেই! –এইভাবেই কাটছিল। তাছাড়া অস্বীকার করে লাভ নেই মিষ্টিদির সাথে দু-একবার নিয়োগীর সাক্ষাৎ পেয়ে সে বেশ ভক্ত হয়ে গিয়েছিল লোকটার। শান্তিনিকেতন বেড়াবারও ইচ্ছে ছিল আর তখন ছুটিও ছিল। সব মিলিয়েই এসে গিয়েছিল। আর একটা স্বপ্নও ছিল যদি তালেগোলে কোন ফিল্মি তারকার সাক্ষাৎ পেয়েই যায়! অন্তত সেই সময়ে ফিল্মের জগতটা ওর কাছে ছিল একটা আলাদা মায়া। পুরো ক্যাম্পটা দারুণ হয়েছিল। খুব ভাল কেটেছিল দিনগুলো। শেষ দিনের অনুষ্ঠানও জমজমাট। প্রথম যৌবনে নিয়োগী কিছু প্রেমগিতি লিখেছিল। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে অখিলেশ নিয়োগীর স্বরচিত গানের সিডি, 'হৃদি কমল' প্রকাশ করেছিলেন বিখ্যাত সুরকার হিমাংশু জানা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে তিনি নাকি এই গানগুলি সিডি হওয়ার পর প্রথম যেদিন শোনেন - শুনতে শুনতে সারারাত কেঁদেছিলেন। গানগুলি তাঁরই সুরদান আর গেয়েছিলেন বিখ্যাত গায়ক বিপিন রুইদাস। সিডির দাম ছিল প্রত্যেকটির জন্য দেড়শ টাকা। বিখ্যাত চিত্র পরিচালক অনিমেষ খাঁড়া তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর স্বপ্ন ছিল একটা নৃত্যনাট্য করার। এই গান গুলি শুনেই তিনি বুঝেছেন যে তিনি তাঁর স্বপ্নের বিষয় পেয়ে গেছেন। কে যেন একটা বলেছিল অখিলেশ নিয়োগীর 'শ্যামা সঙ্গীত!' বিস্মৃতপ্রায় এক অধ্যায়। কিন্তু এখানে সুজয় নামে কোনও লোক কোথায়? কেন কুয়াশায় মোড়া একটা অবয়ব হয়ে বারবার ফিরে আসে আর হারিয়ে যায়!

শুধু একটা সন্ধ্যা। একটা হিমানী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। দিনটা ছিল শনিবার, পরের দিন অর্থাৎ রবিবার মূল অনুষ্ঠান। সকাল থেকে সবাই রিহার্সাল দিতে দিতে ক্লান্ত। নিয়োগী-ই প্রস্তাবটা দিল, 'চলো, প্রান্তিক স্টেশনে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ ওঠা দেখে আসি।' সবাই তো একপায়ে খাড়া। একেই সারাদিনের ধকলের পর একটু হাত পা ছড়াতে চাইছিল সবাই। তার ওপর নিয়োগী নিজে এই প্রস্তাব এনেছে। জনশূন্য স্টেশনটাতে একটাই ছোট্ট ভিড় ছিল সেটা নিয়োগীকে ঘিরে। ওই সময়টা ওই জায়গাটা বেশ ভালো লাগছিল তাই একটু দলছাড়া হয়ে একা একটা প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল ইন্দ্রাণী। কখন যেন সন্ধ্যে নেমে গেছে, চাঁদ উঠে গেছে, পৌষালি হিমের গুঁড়ো ঝরে পড়ছে চারপাশে। শীতের অনুভবটা মনে হতেই সম্বিত ফিরে দেখল সে এক্কেবারে একা হয়ে গেছে। বাকিরা কখন ফিরে চলে গেছে।

নিয়োগীর কাছাকাছি হবার প্রতিযোগিতায় কেউ আর খেয়ালই করেনি যে সে রয়ে গেছে! শীতবোধটা এমনিতেই তার প্রবল, তার ওপর এই ফাঁকা জায়গায় বীরভূমের শীত!

গায়ের চাদরটা দিয়ে কান মাথা ভালভাবে ঢেকে তারপরে ভাবতে শুরু করল কি ভাবে ফেরা যায়। রাস্তা অবশ্য সোজা, কিন্তু অসম্ভব নির্জন, তার ওপরে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতেই দেখল একটু দূরে একজন কেউ একটা বাইসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! কাছাকাছি আসতে বলল, 'আমি সুজয়। সবাই তো দেখছি চলে গেছে! চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।' এর আগে দু'একবার ওকে ওই দুপুরের ক্যাম্পগুলোতে দেখেছিল তাই নামটা শুনে চিনেও গিয়েছিল। গলার স্বরে কোন বিশেষত্ব ছিল কি? না; সেরকম কিছুই না। মামুলি ভদ্রতা করেই বলা। তবু এই নির্জন রাস্তায় একজন চেনাজানা স্থানীয় মানুষ সঙ্গী হিসেবে মন্দের ভাল! এই ভেবে এগোতে লাগল ইন্দ্রাণী।

'আপনি বাড়ি ফিরবেন না?', ভদ্রতা করেই জিজ্ঞাসা করে ইন্দ্রাণী।

'ফিরব, তবে কখন জানি না। হয়তো আজ সারারাত এখানেই কাটাব! অথবা অনেক রাত্রে বাড়ি যাব। সবই নির্ভর করছে...'

'কেন? কার ওপর নির্ভর আপনার বাড়ি ফেরা? বলতে পারেন যদি আপনার মনে হয়!'

'আপনি মিথোলজিতে বিশ্বাস করেন? যদি বলি এইরকম হিমানী পূর্ণিমার রাতগুলোতে এইখানে আমি কোনও এক বনদেবীর অপেক্ষা করি! নীলিমা চলে যাবার সময় বলেছিল –বাঁধভাঙা জ্যোৎস্না যখন হিম হয়ে জমে যাবে তখন সেই শীতল কঠিন জ্যোৎস্নায় তার প্রতিরূপ ফুটে উঠবে। সত্যি সত্যি হয় কি না জানি না। কিন্তু আমি দেখি, হয়তো সবটাই আমার কল্পনা। গ্রাম দেশে এই সব গল্প ছড়ানো থাকে, আমি বিশ্বাস করি না তাও আসি।'

কে নীলিমা? এই মায়া হয়ে যাওয়া একটা অদ্ভুত পরিবেশে এই প্রশ্নটাই অবান্তর মনে হল ইন্দ্রাণীর। ও গল্পটা শুনছিল চুপচাপ।

'ওই যে পুলটা দেখা যাচ্ছে, আলোও দেখা যাচ্ছে, আর আপনার ফিরতে কোন অসুবিধে হবে না।', ওখান থেকেই বিদায় নিয়েছিল ছেলেটা, 'এটা নিছকই একটা গল্প ম্যাডাম, সত্যি না, আমিও এখন বাড়ি ফিরব। একা অপরিচিত মানুষের সাথে চলতে আপনার ভয় লাগত, বিরক্ত লাগত হয়তো। তাই একটা গল্প ফাঁদলাম!' বাইসাইকেলটার ওপর চড়ে বসে প্যাডেলে পা রেখে অল্প একটু ঘুরে তাকিয়েছিল ওর দিকে আর এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'I sacrifice this Island unto thee, / And all whom I loved there, and who loved me; / When I have put our seas 'twixt them and me, / Put thou thy sea betwixt my sins and thee. / As the tree's sap doth seek the root below / In winter, in my winter, now I go, / Where none but thee, th' Eternal root / of true Love, I may know'.... 'আসি।'

হিমজমে যাওয়া ভুতুড়ে কুয়াশায় ঢাকা ক্ষয়াটে জ্যোৎস্নায় ওর মুখটা ভালো করে দেখতেও পায়নি ইন্দ্রাণী। রাস্তাটা সোজা গিয়ে গোল থালার মতো হলুদ চাঁদটাতে শেষ হয়েছে আর ওই বাইসাইকেলটা সেই চাঁদটার দিকে উড়ে যাচ্ছিল। সাইকেলটার রডেরওপর কুয়াশা একটা অস্পষ্ট অবয়ব তৈরি করে ফেলেছিল। সেদিন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নিজের অস্তিত্বটা হারিয়ে ফেলেছিল ইন্দ্রাণী। চাঁদটা আস্তে আস্তে করে খুব কাছে চলে এসেছিল।

ব্যাস ওইটুকুই। শেষদিনের অনুষ্ঠানে সুজয় এসেছিল কি না তা আর খেয়ালই পড়ছে না এখন। এসেছিল হয়তো। অত খেয়ালই করেনি। তাছাড়া সেদিন তো নিয়োগীর দিন। অখিলেশ নিয়োগী সেদিন তার বক্তব্যে চর্যা থেকে শুরু করে মঙ্গল কাব্য এবং বাংলার কবিগান ছুঁয়ে দিচ্ছিল অনায়াস দক্ষতায়। নিয়োগীর পুরো ভাষণটা সুচন্দ্রাদি লিখে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে সুচন্দ্রাদির দখল ছিল তাক লাগিয়ে দেবার মতো। ইন্দ্রাণী শুধু একটাই ভয়ই পেয়েছিল লোকটা উচ্চারণগুলো না গুলিয়ে ফেলে!মাঝখানে একবার বেরিয়েও এসেছিল ইন্দ্রাণী। ভুবনডাঙার মাঠ থেকে দেখছিল কি নরম ভাবে আলো জ্বলে উঠেছে মাঠ পারের বাড়িগুলোতে। দোকানগুলোতে মানুষের ভিড়। সবই চলমান জীবনের ছবি। কিছু একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল ওর। পরের দিন সকালের ট্রেন ধরেই ফিরে চলে এসেছিল কলকাতায়। একাই। কাজের অজুহাত দেখিয়ে। আর ভাল লাগছিল না।

ফিরে আসার পরেও খুব মসৃণ হয়নি সবটা। সেই 'নায়িকা সংবাদ' করার কল্যাণে জানা নেই শাখায় শাখায় পল্লবিত হয়ে নিন্দা মন্দের মহীরুহ হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রাণী কোনও ইঁদুর দৌড়ে ছিলই না সিনেমায় চান্স পাওয়ার

পরেও। ইন্দ্রাণী ওই নিয়ে আর কোন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির দিকে এগোয়নি। চুপচাপ সমস্ত কিছু থেকে সরে এসেছিল। ততদিনে অবশ্য চাকরিটা পেয়ে গেছে। প্রথমেই পোস্টিং পেল মালদায়। এত সব কিছু ও জানতেও পারে নি। পরে মিস্টিদি বলেছিল সমস্ত ঘটনাটা। মালদাতে দুবছর থাকার পরে বদলি হয়ে গেল বালুরঘাট। এর মাঝেই অদ্ভুতভাবে জীবনে শুভঙ্কর চলে এলো। পুরো জীবনটাই পালটে গেল ইন্দ্রাণীর। এই সবে মাস দুয়েক হল কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে ইন্দ্রাণী। এখন আর ওই গ্রুপটার সাথে কোনও যোগাযোগ-ই নেই।

শুভঙ্কর বিদেশে গেছে দু'বছরের ডেপুটেশানে। আগামী মার্চেই ফিরবে। ফিরে আর একটা দিনও অপেক্ষা করবে না –একদম হুমকি দিয়ে রেখেছে! মানুষটা খুব ভাল। একা একা বিদেশ বিভূঁইয়ে কেমন আছে? খুব মায়া লাগে ইন্দ্রাণীর। এই মায়া লাগা ব্যাপারটা আগে হলে নিজেই অবাক হতো কিন্তু এখন আর অবাক লাগে না। বাইপাসের ধারে একটা ফ্ল্যাট কিনে রাখা আছে, নিজের আসন্ন নতুন সংসারটিকে একটু একটু করে সাজাচ্ছে ইন্দ্রাণী।

সব ঠিকই আছে –শুধু মাঝে মাঝে অচেনা একটা পাখির ডাক... কুয়াশায় হারিয়ে যায় একটা মানুষ... প্রায় জন্মান্তর থেকে উঠে আসা একটা নাম...। ফ্যাকাসে একটা তারা মাঝে মাঝে রঙ পাল্টে পাল্টে রক্তমুখি হয়ে যায়... ব্যাস এইটুকুই... বাকি সব ঠিকই আছে।♦♦♦

ওরাও স্বপ্ন দেখে

চয়ন মণ্ডল

আচ্ছা সেদিন যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল, তারা কি সবাই স্বপ্ন দেখে! তারা কি স্বপ্ন দেখে বৃষ্টিতে ভেজার, নাকি এক চিলতে জমি আর অল্প একটু খাবার। তারা কি সেদিন সোঁদা মাটির গন্ধ পেয়েছিল? নাকি দূর থেকে ভেসে আসা কোন এক খাবারের গন্ধে ছিল মাতাল। গাছের পাতাগুলো যেমন বৃষ্টির প্রথম স্পর্শে আনন্দে নেচে উঠেছিল, সেই নাচের ছন্দ কি তাদের মনে কোন উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করেছিল? পাকা রাস্তার পাশে চুপটি করে বসে থাকা ওই মানুষগুলো, শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। দেখে সাদা, কালো আর রঙিন গাড়ীগুলো, আর হয়তো চেষ্টা করে গাড়ীর ভিতরের মানুষগুলোকেও দেখতে। কিন্তু ওরা যে খুব ব্যস্ত, জানলার বাইরে কি হচ্ছে তাতে ওদের নেই ইন্টারেস্ট, বরং চাকার জোড়ে জল ছিটিয়ে দেওয়াতেই ওদের উদ্যামতা। আজ তোমার সাথে ভিজব আমি, তোমার পাশে, তোমার বুকে। সত্যি ওরাও ভেজে, ঠিক এইভাবে, কিন্তু ওটা ওদের ভাললাগা নয়, শুধুই ভাগ্যের পরিহাস। বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ তো শুধু তারাই পায়, যাদের মাথা গোঁজার একটা ঠিকানা আছে। মেঘলা আকাশটা হঠাৎ রোম্যানটিসিজম্ আর স্মৃতি রচনার একটা নতুন প্লট হয়ে ওঠে তাদের কাছে। কিন্তু গৃহহীন এই মানুষগুলোতো এই আকাশের সব রঙগুলোকে খুব ভাল করে চেনে, তাই মাথার উপর হয়ে যাওয়া হঠাৎ রংবদলের খেলায়, ওদের মনে ভয় ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।

তাও ওরা স্বপ্ন দেখে। না, বড় কোন ফ্ল্যাটবাড়ি কিংবা ভাল একটা গাড়ীর নয়, বরং দুবেলা দুমুঠো ভাত আর মাথার উপর ছোট্ট একটা ছাদ। রঙিন জামাকাপড় কিংবা ultra modern lifestyle - এর নয়, বরং শীতের হাত থেকে বাঁচতে একটা মোটা চাদর আর একটা ভাঙা ছাতা। ওরাও মানুষ, শরীর ওদেরও খারাপ হয়। না না ওরা দামী নার্সিংহোমের কথা স্বপ্নেও ভাবে না। তবু যদি কোন দিন কেউ এক পাতা ওষুধ হাতে দিয়ে বলে, 'এটা খেও, ভাল হয়ে যাবে' - সেটাই ওদের কাছে সঞ্জীবনী। কিন্তু দূরত্বটা যেন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। অভাগা মানুষগুলো যতই একটু আলোর আশায় কাছে আসে, আমরা সভ্য সমাজ আরও অনেক বেশী দূরে চলে যাই - নিজেদের status maintain করতে। দূরত্বটা হয়ত কোনদিন শূন্য হবে না, তাও যদি কোনদিন রাস্তার পাশে বসে থাকা ক্ষুধার্ত মানুষগুলোকে একদিন খাওয়াতে পারো, অথবা ঠেলাগাড়ি করে ঘুড়ে বেড়ানো ওই ছোট্ট ছেলেটাকে খুশি করতে নিজের জমানো অর্থের কিছুটা ব্যয় করো, সেটাই অনেক - ওদের কাছে। ♦♦♦

কাম্ ব্যাক ফেলুদা

গার্গী ভট্টাচার্য্য

ও ফেলুদা, করছি তোমায় ভীষণ রকম মিস্,
আর একটি বার নতুন করে এসো না গো প্লীজ।
"কাকাবাবু" কবেই গেছেন, রিসেন্টলি সেই দিন,
"মিতিন মাসীও" চলে গেলেন ঘোড়ায় দিয়ে জিন্।
"কর্ণেলও" যে কোথায় গেলেন কেউ রাখে না খোঁজ,
"অর্জুনেরও" খবর এখন পাই না মোটেই রোজ।
"পাণ্ডবেরা" বড্ড ছোট, কত্তো দিকে যায়?
তাছাড়া তো তাদের আবার স্কুলেও যেতে হয়।
"সি.আই.ডি" তো বম্বে থেকে পায় না মোটেই ছাড়া,
হাজার রকম কেসের বোঝা করছে তাদের তাড়া।
"কে.ডি" তো আর গোয়েন্দা নন, কোর্টের ব্যারিস্টার,
কোলকাতাতে আসার কোনো সুযোগই নেই তার।
চোর, ডাকাত আর মার্ডারারে দেশটা গেল ভরে,
বলো দেখি এখন তবে বাঁচবো কেমন করে?
এখন তবে আসবে কবে তাড়াতাড়ি বলো,
আসবে আসবে ভেবে ভেবেই সময় চলে গেল।
আচ্ছা শোনো, তোপসেটাকেও সঙ্গে করে এনো,
'জটায়ু' দাদার শেষ বইটার নাম কি ছিল যেন!
যাক্ গে যাক্, একটা কপি রেখে দিও কাছে,
এখনো কি জটায়ু সেই আগের মতই আছে?
এই যে দেখো ভুলেই গেলাম, 'সিধু জ্যাঠা' কই?
এখনো কি দিন-রাত্রি পড়েন তিনি বই?
ও ফেলুদা, আসবে কবে জানিয়ে দিও মেইলে,
আসবো সবাই আনতে তোমায় আসার খবর পেলে।
কথা হবে তখন আবার, এখন তবে যাই?
ও ফেলুদা! এলাম গো, আজ মেইলটা যেন পাই।

*(**সি.আই.ডি - সোনি চ্যানেলের একটি জনপ্রিয় গোয়ান্দা ধারাবাহিক*
***কে.ডি.পাঠক - সোনি চ্যানেলেরই আর একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক*
"আদালতের" মুখ্য চরিত্র)

ফেলুদাই হতে চাই

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার এই স্বপ্নের রামধনু আকাশে
কত রঙ কত ছবি তুলি দিয়ে আঁকা সে।
কখন বা মহাকশে কখন বা পাহাড়ে
কখনো বা যাযাবর পথ ডাকে যাহারে।
কখনো বা রাজনেতা, কখনো বা ক্রিকেটার,
কখনো বা সভা মাঝে সে যে বড় মেন্টর।
কিন্তু সবার মাঝে সবাইকে ছাড়িয়ে
কে ও হাসি মুখে দুই হাত বাড়িয়ে?
ঝকঝকে চোখে তাঁর বুদ্ধির আলো যে
ভেদ করে আঁধারের যত সব কালো যে।
জানি ওকে, চিনি ওকে, ও আমার হিরো যে
ওর পাল্লায় পড়ে মস্তানও জিরো যে।
ও আমার ফেলুদা, প্রদোষের চন্দ্র
অপরাধ দুনিয়ায় জাগে সে অতন্দ্র।
সোনার কেল্লা বা কৈলাস ইলোরার,
ছেলেধরা অথবা সে বদমাশ স্মাগলার;
যত কিছু কাণ্ড স্বদেশে বা বিদেশে
সব কিছু সমাধান করে এক নিমেষে।
ক্ষুরধার বুদ্ধিতে শান দেওয়া অস্ত্র,
ছুরি নয়, ছোরা নয়, সে যে মগজাস্ত্র!
ছোটবেলা বড়বেলা, সব বেলার আইকন
ফেলুদার মতো নয়, ফেলুদাই হব 'খন।
তোপসে ও জটায়ু ফেলুদার সাগরেদ
পাই ভালো, না পেলেও করব না কোনও খেদ।
হতে চাই ফেলুদা, অলয়েজ অ্যাকটিভ,
এসিয়াজ বিগেস্ট ক্রাইম ডিটেকটিভ!

ফেরা
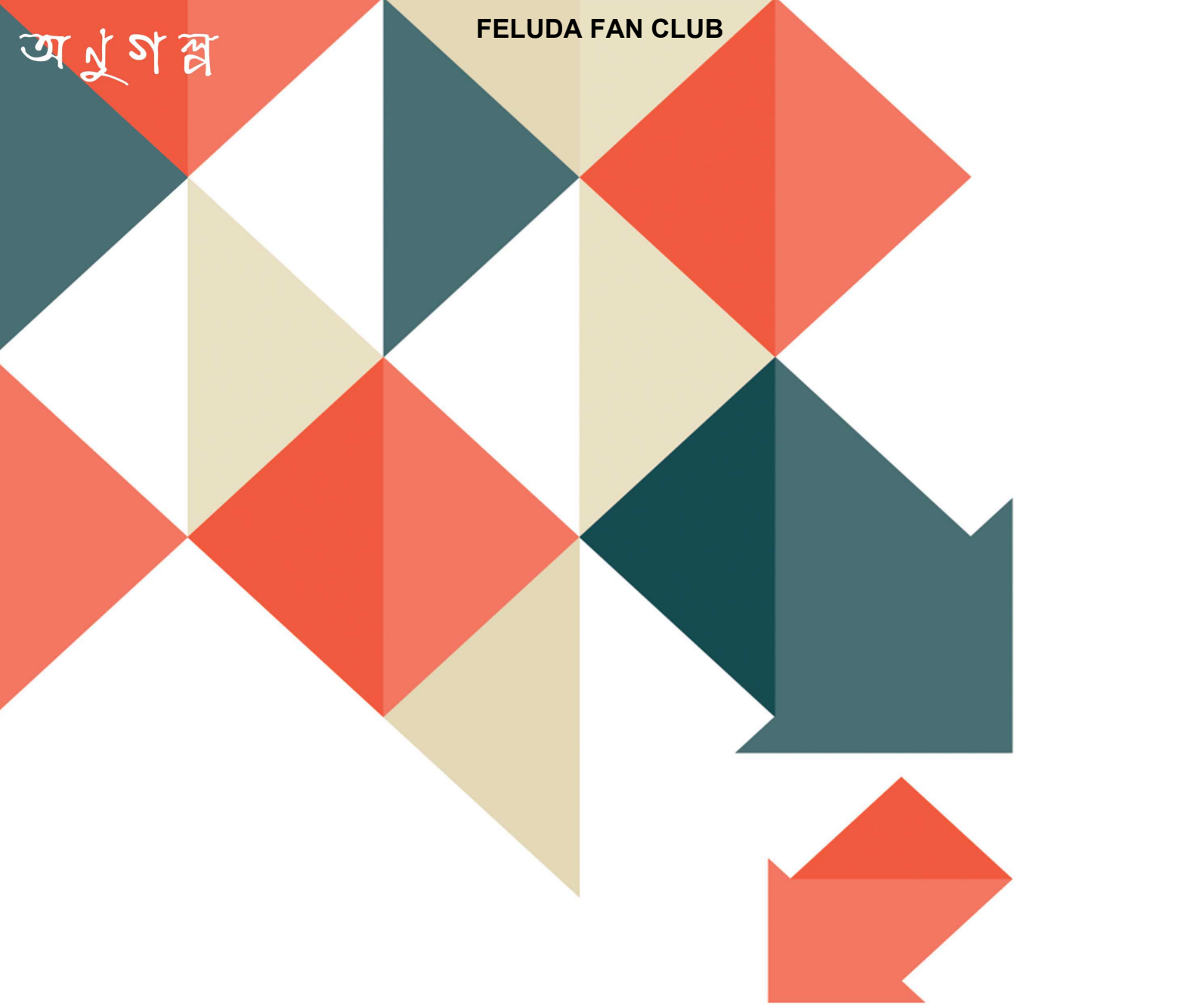
ঋজু পাল

সকালে বাড়ি ফিরলাম, শরীরটা বড্ড দুর্বল এখনও। তিন দিন হসপিটালের বিছানাতে কাটানোর পর আজ নিজের চেনা পরিবেশে ফিরতে খুব ভাল লাগছে। বাড়ির পরিবেশ এখনও থমথমে। বউদি পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে চোখ লাল করে ফেলেছে। বাবা সেই যে ট্যাক্সি থেকে আমায় নামিয়ে ঘরে নিয়ে এল, তারপর থেকে আর দেখতে পাচ্ছি না। মা বোধহয়

ঠাকুর ঘরে, যমের মুখ থেকে ছেলে ফিরে এসেছে, ঠাকুরের প্রাপ্য ধন্যবাদটুকু দিতে গেছে! আর আমি? খোলা জানলা দিয়ে চারপাশের আলো ঝলমলে আকাশটাকে দেখছি, সত্যিই কি কোন দরকার ছিল ওরকম একটা পদক্ষেপ নেওয়ার? জানি না।

হঠাৎ আমার সাত বছরের পুচকু ভাইপো এসে বলে ফেলল; কাকু তুমি আর যাবে না তো আমায় ছেড়ে? তাহলে আমায় ঘুরতে কে নিয়ে যাবে? বাবার মত তুমিও স্টার হয়ে.........।

ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম, না সোনা, কোথাও যাব না আমি। প্রমিস করলাম।

নাহ, এত ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করার মত দুঃসাহস আমার নেই। নতুন জীবন শুরু করতে আমায় হবেই, পুরনো ডায়েরিগুলো কি করব, ফেলে দেব? স্মৃতি আঁকড়ে বসে থেকে কোনও লাভ নেই।

এই তো সেদিনের কথা, TCS-এর ক্যাম্পাস প্লেসমেন্ট চলছে। দুটো ধাপ টপকে দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছি শেষ ধাপের জন্য। মনে হচ্ছে পারব না, হবে না। মোবাইলটা বন্ধ করতে গিয়ে একটা মেসেজ চোখে পড়ল, All the best dear! you have 2 do it.

মুহূর্তেই হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। তারপর? ....

----হ্যালো, রাহুল দা, selected!!!!!!!!!!

---জানতাম এটাই হবে। Heartiest congratulations!!!! যা বাড়ি যা, রাতে ফোন করছি।

এই হল রাহুলদা, আনন্দে টগবগ করলেও বাইরে থেকে বোঝা যায় না। দেখতে দেখতে দুবছর হয়ে গেল, we r in a relationship! আমাদের আলাপ Rainbow Pride Fest walk এ। নিছক বন্ধুত্ব, তারপর একটু একটু ভাল লাগা, অতঃপর ভালবাসা। আজ চেন্নাইতে থাকলেও প্রতিদিন যোগাযোগ রাখা,কথা বলা কোনটাতেই খামতি নেই।

মা খুব রাগারাগি করেছিল, বউদিও, কলকাতা ছেড়ে চেন্নাই কেন যাচ্ছি। মাকে কোনমতে বুঝিয়েছিলাম, চাপের কি আছে, রাহুলদা আছে তো, এক অফিস, এক এপার্টমেন্ট, কোন অসুবিধা হবে না।

বাড়িতে সবাই জানে, রাহুলদা আমার খুব প্রিয় বন্ধু, কিন্তু ওই টুকুই। তার বেশি কিছু বলার মত সৎ সাহস আমার ছিল না।

তারপর আর কি, চেন্নাইতে পা দেওয়া, একে নতুন জীবন, তারপর নিজের ভালবাসার মানুষের সঙ্গে একসাথে থাকতে পারার আনন্দ যে কতটা হতে পারে, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এক সাথে অফিস যাওয়া, ফেরার সময় ঘুরে ফিরে ফ্ল্যাটে আসা, রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা, আর অনেকটা ভালবাসা!

সব তো ঠিকই চলছিলো, তবু কেন এমন হল ... রাহুলদার বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য জোর করা, অপ্রত্যাশিত ভাবে ওর রাজি হওয়া, নিজের একটা আলাদা এপার্টমেন্ট খুঁজে নিতে অনুরোধ করা, আমার কান্নায় ভেঙে পরা ....সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল!

ক'টা ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, তবে এটুকু খেয়াল আছে বাড়ির আর অফিসের অনেককেই হসপিটালে দেখতে পেলেও, একজনকে পাই নি। আমার অভস্ত্য চোখ শুধু খুঁজে বেরিয়েছে তাকে, একসময় ক্লান্ত হয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে।

বাবু, তোর একটা চিঠি এসেছে, এদিকে আসতে পারবি? বউদির গলা শুনে চমকে উঠলাম। নিজের অজান্তেই কখন অতীতে ফিরে গেছিলাম। সই করে চিঠিটা নিয়ে দেখি, Tech Mahindra-র অফার লেটার! কবে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম আর আজ এল, পোস্টিং কলকাতাতেই।

কার চিঠি রে? মা এগিয়ে এল।

মা, আমি TCS ছেড়ে ভুল করি নি, আমি রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। এবার নতুন করে সব শুরু করব, শুধু তোমাদের জন্য!

হার সৌরভ কোনদিন মানে নি, মানবেও না। ♦♦♦

আখর বন্দ্যোপাধ্যায়

টিনটিন

চার্লি চ্যাপলিন

এক মুঠো বিদ্রোহ

বৃষ্টি ভেজা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছি। এত বৃষ্টিতে যে কিভাবে বাড়ি যাব জানিনা। জানালার কাঁচ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অমৃতা মাথা থেকে জুঁই ফুলের মালাটা খুলে ফেলল। তখনই তার মোবাইল বেজে উঠল, মোবাইল স্ক্রিনে মেয়ে টুটুনের নাম। নিমেষের মধ্যে বৃষ্টি ভেজা দিনের স্যাঁতস্যাঁতে মনটা আবার সজীবতা পেল। অমৃতা ফোনটা রিসিভ করল।

বলল, "হ্যালো। বল।"

ফোনের ওপাশ থেকে আওয়াজ ভেসে এল, "হ্যালো মা, তোমার এখনও গাড়ি আসেনি? কখন আসবে?"

"কি যে বলি? দেখ কত দেরী হয়ে যাচ্ছে, বলছে ওদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে তাই নিয়ে যেতে পারবে না, তোর বাপি ফিরেছে?"

"না ফেরেনি। তোমাকে আমি নিয়ে আসব ড্রাইভ করে? প্রোগ্রাম কেমন হল?"

"ভালই হয়েছে। কিন্তু না না তোমাকে এখন বৃষ্টির মধ্যে ড্রাইভ করতে হবে না। পারবে না, মাঝ পথে আটকা পড়লে আবার সমস্যা।"

"মা আমি কলেজে পরি। ছোট নই। আমি পারব।"

"তুমি আমার কাছে ছোটই থাকবে সবসময় আর এই বাজে ওয়েদারে না বেরোনই ভাল, তুমি চিন্তা করো না, রিন্টু এখুনি এসে পড়বে। ওকে ফোন করে দিয়েছি অনেকক্ষণ আগেই।"

"আচ্ছা, তুমি রিন্টুদাকে বলোতো কাল আমার কলেজে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তাই যেন তাড়াতাড়ি আসে। তাহলে রাখি মা?"

"আচ্ছা তুমি ডিনার করেছ?"

"না এখনও করিনি।"

"টেবিলের উপর রাখা আছে ঢাকা দিয়ে, খেয়ে নিও আর রাত করো না। আমি রিন্টুকে বলে দেব।"

"আচ্ছা।"

অমৃতা ফোনটা ছাড়তেই টক টক করে দরজাতে টোকা পড়ল, বলল, "আসুন...আরে রিন্টু এসে গেছ এত দেরী করলে কেন?" রিন্টু মাথা নিচু করে বলল, "আর বলবেন না ম্যাডাম, এখানে আসতে আসতে যা জল এই বৃষ্টিতে কলকাতা পুরো ভ্যানিশ দেশের মত হয়ে গেছে। এই সবাই বলছে তাই শুনলুম।" অমৃতা অবাক হয়ে বলল, "ভ্যানিশ!"

"হ্যাঁ জলের মধ্যে শহরটা।"

"ওহ ভেনিস, তাই বল, আসলে ওটা হবে ভেনিস"

"আমি কি আর এত জানি?"

"ঠিক আছে কাল তোমাকে সেই জায়গার ছবি দেখাব টুটুনের কাছে আছে।"

"আচ্ছা ম্যাডাম।"

গাড়িতে ওঠার রাস্তাতে জলসার কিছু লোক ভিড় করেছিল, তাদের মধ্যে কিছু লোক অটোগ্রাফের জন্য ভিড় করেছে, তাদের অটোগ্রাফ দিয়ে অমৃতা গাড়িতে উঠে পড়ল, বলল নাও আর দেরী করো না। গাড়িও স্টার্ট নিল, অমৃতা বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানে এসেছিল গান গাইতে, কলকাতাতে এক জন ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তার নাম ডাক আছে। তার পাঁচটা গানের অ্যালবামও বেরিয়েছে, দু' তিনটে পত্রিকাতে তার ইন্টারভিউও বেরিয়েছে, এখন রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা নিয়ে এক জন ডিরেক্টর সিনেমা বানাতে চলেছে তাতে অমৃতাকে গান গাওয়ানো নিয়ে কথা চলছে। এখনও পুরো ফাইনাল হয়নি, সেই ডিরেক্টরের ফোন আসার কথা আছে। সত্যি এমনি এক বর্ষার দিনে তার বিয়ে হয়েছিল, হঠাৎ মোবাইল ফোন বেজে উঠল, অমৃতা ফোনটা রিসিভ করে বলল, "হ্যালো বল।"

"আমি অরূপ, শুনতে পারছ?"

"একটু কেটে কেটে যাচ্ছে।"

"এত বৃষ্টি হচ্ছে বলে।"

"এখন একটু ভাল শোনা যাচ্ছে।"

"কেমন হল প্রোগ্রাম?"

"মনে আছে তাহলে!" অমৃতা হাসল।

"তুমি গাইবে আর আমি ভুলে যাব এ কি করে সম্ভব?"

"যা ব্যস্ত তুমি।"

"আচ্ছা খোঁটা দিচ্ছ।"

"ছাড় ওসব, খাওয়া দাওয়া ঠিক মত হচ্ছে তো? তা কবে আসবে? এক সপ্তাহ ধরে কোনও ফোন নেই তোমার কি এত কাজ থাকে যে নিজের যত্ন নিতে ভুলে যাও।"

"দাঁড়াও রাগ করো না, সব বলছি একটা একটা করে। তার আগে বল গানের প্রোগ্রাম কেমন ছিল?"

"ভালই হল, প্রচুর মানুষ বৃষ্টিতে গান শুনতে এসেছিল, তবে এত জল জমেছে এখানে কখন যে বাড়ি ফিরতে পারব জানিনা।"

"তাহলে বর্ষা মঙ্গলের বদলে অমঙ্গল হয়ে দাঁড়াল। আমি তো আজই আসতাম, কিন্তু এখানেও এত বৃষ্টি হচ্ছে যে ফ্লাইট ক্যানসেল হয়ে গেল, তাই দু দিন পর আসব। লাস্ট উইক এ এই টি এস্টেটে খুব ঝামেলা হয়েছিল, তাই ওসব সামলাতে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই ফোন ধরতেও পারিনি আর করতেও পারিনি, তার উপর এখানে কিছু জায়গাতে ধস পরে রাস্তাও বন্ধ হয়ে পড়েছে। তাই কাজেরও খুব অসুবিধা হচ্ছে।"

"তুমি সাবধানে থেকো, সরি গো বুঝতে পারিনি, তাহলে কাল টুয়েন্টি ফিফত অ্যানিভার্সারিটা ভেস্তে গেল, তবে কি করা যাবে কাজ তো আগে।"

"তা তো আগেই না হলে এত জলের মধ্যেও তুমি গান করতে যাও।"

হঠাৎ করে গাড়িটা থেমে গেল, অমৃতা বলল, "আরে রিন্টু গাড়ি থামালে কেন?"

"দেখুন না ম্যাডাম, একটা লোক গাড়ি দাঁড় করাচ্ছে হাত দেখিয়ে।"

অমৃতা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ফোনটা রাখছি গো। আমি তোমাকে পরে ফোন করছি।"

"আচ্ছা, এনি প্রবলেম?"

"না না তুমি চিন্তা করো না আমি বাড়ি পৌঁছে তোমাকে ফোন করব।"

"আচ্ছা।"

অমৃতা ফোন রেখে দিল। রিন্টু গাড়ির জানালার কাঁচটা নামিয়ে বলল, "আরে মশায় এটা প্রাইভেট কার এই মাঝ রাস্তাতে দাঁড় করালেন!" বেশ চেনা ও ভারী গলায় ভদ্রলোক কথা বললেন, "প্লিজ, আমি এয়ারপোর্টে যাব। আমার ফ্লাইট

আছে একটু পৌঁছে দিন, বড় বিপাকে পড়েছি, মাঝ রাস্তাতে গাড়ি খারাপ হয়ে পড়েছে।"

"তা ট্যাক্সি দেখে নিন না। এটা প্রাইভেট কার।"

"তা তো বুঝতে পারছি কিন্তু কি করি। আমার ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে। কোনও ট্যাক্সি যেতে রাজি হচ্ছে না। আসলে রাতও তো অনেক হয়ে যাচ্ছে। যা টাকা লাগবে আমি দেব।"

অমৃতার গলার আওয়াজটা খুব চেনা চেনা লাগছিল, কিছুতেই বুঝতে পারছিল না কে? এই স্বর সে আগেও শুনেছে।

অমৃতা বলল "ঠিক আছে আমরা তো রাজারহাটেই যাচ্ছি। তাহলে খুব একটা অসুবিধা হবে না। রিন্টু ওনাকে উঠতে বলে লাগেজটা পিছনে তুলে দাও।"

"ম্যাডাম আপনার বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাবে।"

হোক, একটা লোক বিপদে পড়েছে, আমাদের উচিত তাকে সাহায্য করা। আপনি উঠে আসুন।"

রিন্টু গাড়ি থেকে নেমে লাগেজ গাড়ির ডিকিতে তুলে দিল। লোকটার মুখটা এতক্ষণে চোখে পড়ল। এতক্ষণ অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। গাড়ির ভিতরের আলোতে অমৃতার চোখে যেন চেনা চেনা একটা মুখ ধরা পড়ল। সত্যি তো খুব চেনা একজন। প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা তার মনে পরে গেল, তখন সবে স্কুলের গন্ডি পেরিয়েছিল। তার ধীরে ধীরে মনে পরে গেলো সব কথা। তখন মনও এত শত বুঝত না, তাই ভুল করেই একজনকে ভালবেসেছিল, যার মুখ দেখলেই, সে কাছে আসলেই মনের ভিতরে একটা মিষ্টি অনুভূতি ছড়িয়ে যেত শরীরে, প্রথম ভালবাসা বলে কথা। কিন্তু সেই ছেলেটি তার ভালোবাসাকে মেরে অন্য আরেকজনের কাছে চলে গেছিল। অন্য আরেকটি মেয়েকে সে ভালবেসেছিল। অমৃতার ভালবাসা যে এক তরফের ছিল তা কিন্তু নয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছেলেটি বদলে গেল। কত বার তাকে নিজে হাতে ডিমের ঝোল, তরকারি দিয়েছে, ছেলেটি সব ভুলে গেল। অমৃতার বাড়ির কাছেই একটি মেসে ভাড়া থাকত সে। পরিবার সঙ্গে না থাকার দারুণ সে বেপরোয়া বেয়াদপ হয়ে গেছিল। অমৃতা তো রূপে গুণে কিছু কম ছিল না। আর না ছিল তার ভালবাসার প্রতি কোনও ঘাটতি। তবু সেই ছেলেটি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এক দিন নিজের চোখের সামনে ধরা পড়ে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে ছেলেটা তাকে এড়িয়ে চলছিল। তার কোনো কারণ পাচ্ছিল না সে। একদিন বন্ধুদের সাথে সিনেমা দেখে ফিরছিল অমৃতা। দেখল রাস্তার ওপ্রান্তে সে একটি মেয়ের সাথে হাত ধরে হেটে যাচ্ছে। অমৃতা এগিয়া গেল, জিগেস করল মেয়েটি কে? ছেলেটা ওকে এড়িয়ে গেল। আর মেয়েটিও জানাল তারা একে অপরকে ভালবাসে। অমৃতা খুব কেঁদেছিল সেদিন। কিছু বলেনি, তারপর থেকে সমস্ত পাতাটাই উপরে ফেলেছিল জীবন থেকে। সেদিনের পর থেকে আর কাউকে বিশ্বাস হত না। যে তাকে ছেড়ে অন্যর কাছে চলে যায়, সে অন্যকে ছেড়ে আরেক জনের কাছে যাবে না তার কি গ্যারান্টি আছে। সে ভেবে নিয়েছিল ভালবাসা বলে কোনও বস্তুই হয় না। তবু মনে মনে চাইত যে এক বার ক্ষমা চেয়ে যাক সে। একবার বলুক আমি ভুল করেছি। কিন্তু এখন আর সে সবের কোনও দাম নেই সব জিনিসই এক সময় মূল্যবান থাকে। সেই উপযুক্ত সময় চলে গেলে তার আর দাম থাকে না। এত অদ্ভুত সেই সে আজ ত্রিশ বছর পর তার কাছে লিফট চাইছে। অমৃতা চোখ বন্ধ করল। লোকটি বলল, "অমৃতা না? চিনতে পারছ? কত দিন পর! কেমন আছ? আমি পরমব্রত... চিনতে পারছ?"

"হুম, ভালো আছি। তুমি?"

"অমি ভালো নেই।"

"কেন?"

"বাবা মারা গেলেন তাই এসেছিলাম। আমি তো এখানে থাকি না।"

"কি হয়েছিল ওনার?"

"তেমন কিছু নয় বয়স হয়েছিল তো তাই।"

"এই ফিরে যাচ্ছি। এখানে আর কিছু রইল না।"

"কোথায় থাকো?"

"বস্টনে।"

"ওহ, আর কিছু রইল না মানে? শিকড়ের কোনও টান নেই? বউ, সংসার সবাই কি ওখানে?"

"বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু বউ নিজের কেরিয়ার নিয়ে এতই ব্যস্ত যে আমার জন্য তার সময় নেই। সে বেঙ্গালুরু থাকে। দীর্ঘদিন আলাদা থাকতে থাকতে একটা দূরত্ব হতে হতে ডিভোর্স হয়ে গেল।"

"তুমি বাঁধা দাওনি?"

"না দিইনি, কলকাতাতে কাজের তেমন সুবিধা পাচ্ছিল না। আর বাবার সাথেও থাকতে চাইছিল না। আর এর মধ্যে ঝামেলা করে কি হত? তার থেকে বরং যে যা চায় তাই করতে দেওয়া উচিত, না হলে পরে তারা দোষারোপ করে।"

"তবু ভালবাসাতে তো জোর চলে।"

"না চলে না, আসলে আই ডিড রং উইথ বোত অফ ইউ অ্যান্ড শ্রী। সব কৃতকর্মের ফল।"

"শ্রী-এর সাথে তোমার বিয়ে হয়নি?"

"না ওকেও আমি কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিনি। ওর বিয়ে করার তাড়া ছিল। আর আমি তখন সে ভাবে সেটেল হইনি। সমস্ত দোষ আমার, তাই দেখ তোমরা সবাই ভাল আছ।"

"তুমি কি একটুও ভাল নেই?"

"সেটা একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন। একা আর কিভাবে ভাল থাকব তাই সব ছেড়ে দিয়ে বিদেশে পড়ে আছি।"

"ওহ ভেবেছিলাম তুমি নিজেকে ভালোবাস তাই একা বাঁচতে জান। কোনোদিন তো ভালবাসার মূল্য জানলে না।"

"হুম আমি এসবের যোগ্য। তাই ফল ভোগ করছি।" এই বলে লোকটা রিন্টুর পাসে গিয়ে বসল। গাড়িও চলতে স্টার্ট নিল। গাড়ির ভিতরে নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে, কিছুক্ষণ চলার পর গাড়িটা থেমে গেল। রিন্টু বলল, ম্যাডাম আপনারা একটু নামবেন আমি একটু গাড়িটা দেখব। এটার কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে মনে হচ্ছে। ওরা তিন জনে নেমে পড়ল। রিন্টু বলল, চাকা বদলাতে হবে ম্যাডাম। আপনারা সামনের চায়ের দোকানে দাঁড়ান। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। অমৃতা আর পরমব্রত সামনের চায়ের দোকানে গিয়ে দাঁড়াল। এখন বৃষ্টিটাও থেমে গেছে । তবু চায়ের দোকানে টিনের চাল থেকে টুপ টুপ বৃষ্টির জল পড়ছে। চায়ের দোকানের লোকটা বলল, "চা দেব?" পরমব্রত বলল, "এই ঠান্ডা বৃষ্টি ভেজা আমেজে চা হলে মন্দ হয়না।" অমৃতা বলল, "দিন তাহলে দুটো।" দুজনের হাতে চায়ের ভাড় দিল। পরমব্রত টাকা দিতে গেলে অমৃতা বারণ করল। পরমব্রত বলল, "তাতে কি আছে? আমি অন্য কারোর দেওয়া জিনিস খেতে পারব না।" "তাহলে তুমি তোমারটা দাও। আর আমি আমারটা দিই।" ওরা টাকা মেটাল তারপর চায়ের দোকান থেকে একটু সরে দাঁড়াল। পরমব্রত চা খেতে খেতে বলল, "জানি তুমি আমকে কোনও দিনই ক্ষমা করতে পারবে না। আর আমি তার যোগ্য নই। কিন্তু সত্যি বলছি। তোমার সাথে পরিচয় হওয়ার এক বছরের মধ্যেই কেমন যেন বদলে

মেয়েবাজ হয়ে গেলাম। আমি কিন্তু তোমাকে এক সময় সত্যি......" অমৃতা পুরো কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল, "থাক সে'সব দিনের কথা। সেই খারাপ দিন, খারাপ সময়গুলো মনে করতে চাই না। তুমি চলে যাওয়ার পর কোনও মানুষকে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। এই এক মাত্র তোমার জন্য।"

"আমি খুব ভুল করেছি। এতদিন পর তোমাকে সামনে দেখে এটাই বলতে চাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আমাকে সত্যি ভালবেসেছিলে, আমি সে ভালবাসার যোগ্য ছিলাম না।"

"সে অনেক দিন আগেই করে দিয়েছি।"

"না তুমি ক্ষমা করতে পারনি। এটাই স্বাভাবিক। এই যন্ত্রণাটা আমাকে অনেক দিন ধরে কুরে কুরে খেয়েছে। তাই ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা করেছি একবার যেন জীবনে তোমার দেখা পাই। শ্রী-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম। ওর সাথে কথা হয়েছিল ওর বিয়ের পর একবার। ও খুব ভালো আছে। ওর বড়লোক স্বামী ওকে খুব ভালবাসে। আমি অনেক বদলে গেছি যেন। আমি নিজেও সেটা বুঝি। কিন্তু তোমার সাথে কোনদিন দেখা হয়নি যে এসব বলব তোমাকে।"

"সে তুমি চাওনি। বাড়িতেও তো আসতে পারতে। আমার বাড়ি তো তুমি চিনতে।"

"মাথা খারাপ......মনে হত এই কেউ যদি আমাকে দেখে তো পা ভেঙ্গে দেবে। তবে সত্যি তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে অনেক বার গেছি।একটু দেখা পাবার আশায়।"

"ওহ।"

"আমি কলকাতাতে আসলেই তোমার খবর নি। তোমার পাঁচটা গানের অ্যালবাম বেরিয়ে গেছে। আমি সব কটাই শুনেছি। তুমি এখন বরং আগের থেকেও আরও সুন্দর গাও। তোমার একটি মেয়েও আছে।"

"ভাল। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি অনেক বদলে গেছ। শুধু বয়স নয় মনের দিক থেকেও। আর খুব ধীরে ধীরে কথা বল।"

"হুম চেঞ্জ তো হয়েছিই দ্যাট আই অলসো অ্যাডমিট। তুমি চলে যাওয়ার অনেক পরে হয়েছি। তুমি আগের থেকে অনেক কম কথা বল।"

"তখনকার বয়স আর এখনকার বয়স তো সমান নয়।"

"একটা সত্যি কথা বলছি অনেকদিন পর তোমার সাথে কথা বলে খুব ভাল লাগছে। আর খুব ভাল আছ জেনে খুব খুশি হয়েছি। তোমার কার সাথে বিয়ে হল? সেই এন. আর. এস.-এর ছেলেটার সাথে?" অমৃতা হেসে বলল, "ওহ সেই কথা তোমার মনে আছে? না গো সে তো বানিয়ে তোমাকে বলেছিলাম। যাতে তুমি জেলাস হয়ে ফিরে আস। কিন্তু যেখানে ভালবাসা নেই সেখানে এগুলো বৃথা। অল্প বয়সের বোকা বুদ্ধি। পরে কলেজ শেষ হওয়ার পর আমার হাসব্যান্ডের সাথে পরিচয় হয়। পাক্কা দু'বছর প্রেম। তারপর বাড়ির সম্মতিতে বিয়ে।"

"গুড, ভেরি ফিউ পিপল আর লাকি। ভালোবেসে বিয়ে।"

"ইচ্ছে থাকলেই হয়।"

"সরি ফর দ্যাট। আই ওয়াস ভেরি রুড। অনেক ভুল করেছিলাম সেই সময়। তোমার কোনও ভুল ছিল না। দ্যাটস্ ওয়াই ইউ আর হ্যাপি টু ডে। পাস্ট কে চিন্তা করে খুব গিল্টি ফিল করি। তোমার বর জানে আমার কথা?"

"অনেক দিন আগে বলেছিলাম। সেই প্রথম পরিচয়ের সময়ে। কিন্তু তোমাকে মনে করা মানে আমার অতীতের কালো দিনগুলোকে খুঁচিয়ে বার করে দুঃখ পাওয়া। তাই আর ওসব দিনের স্মৃতির কাগজ ছিঁড়ে ফেলেছি।"

"সব কিছু খারাপ ছিল না। আই ক্যান রিমেম্বার দ্যাট ডে ওয়েন আই গেভ ফোন নাম্বার। তারপর ডিনার করতে যাওয়ার আগে ফোনে মিস কল দিলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতে। আর আমি সাইকেল নিয়ে নিচ দিয়ে যেতাম। তোমার সাথে দেখা হত।"

"হুম সব ভুলে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে যখন আমার আলাপ তখন তুমি সবে কলেজে পড়ছ।"

"হুম।"

"তোমার হাসব্যান্ড কি করে?"

"টি এস্টেটের ম্যানেজার।"

"বাহ খুব ভাল। তোমার বাড়ি?"

"রাজারহাটে নতুন বাড়ি নিয়েছি।"

"তুমি দেখতে একই রকম রয়ে গেছ, চুল পাকেনি, শুধু একটু মোটা হয়েছ।"

"ওহ সে সবার পাকে, রং করেছি।"

"লুকিং গুড এখনও।"

"তোমার বেশির ভাগ চুলই পেকে গেছে। রং করনা?"

"নাহ, সব যেন মাঝে মাঝে ভ্যালুলেস লাগে।"

রিন্টু বলল, "ম্যাডাম গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।" ওরা গাড়িতে উঠে বসল। সারা রাস্তা ওরা দু'জন আর কোনও কথা বলল না। গাড়িও খুব স্পীডে চলেছে। ওদের মনের নিস্তব্ধতা যেন গাড়ির ভিতরে ছড়িয়ে পরেছে। ওদের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে একটা ফ্লাইট আওয়াজ করে উড়ে গেল। এয়ারপোর্টও আর দেরী নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়ল। রিন্টু গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, এয়ারপোর্ট এসে গেছে। পরমব্রত নামল। গাড়ির ডিকি থেকে স্যুটকেসটা নামাল রিন্টু। পরমব্রত পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করল। অমৃতা বুঝতে পেরে বলল, "দরকার নেই। তোমার দেরী হয়ে যাবে। এমনিতে অনেক দেরী করে ফেলেছ। একটা বিপদে পরা লোককে সাহায্য করেছি মাত্র।"

"আজ এত বছর পর কথা বলে খুব ভাল লাগল। পুরনো খাতাতে নতুন বন্ধুত্ব থাকল। আর খারাপ যাক বৃষ্টির জলে ধুয়ে।"

"খুব ভালো বললে কথাটা। সাবধানে যেও।"

"আজ যে কনফেসান তোমার কাছে করতে পারলাম তার জন্য ভাগবানকে অশেষ ধন্যবাদ... আজকের দিনটা আমায় দেওয়ার জন্য। এত সাহস আমার আগে কোনদিন ছিলনা তোমার সামনে এসে দাঁড়ানোর। এমন এক বর্ষার দিনে তোমার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। দেখ আজকের শেষ দেখা হওয়ার দিনটাও বর্ষণমুখর। কি অদ্ভুত, চেরিশ থিংস ওয়াইল ইউ হ্যাভ দেম...ওয়ান্স দে আর গন, ইউ উইল রিয়েলাইজ হাউ প্রেশাস দে অয়্যার। ইটস আয়রণিক্যাল, লাইফ ক্যান ওনলি বি আন্ডারস্টুড ব্যাকোয়ার্ড, বাট হ্যাজ টু বি বিলিভড ফরোয়ার্ড। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবার জন্য। আজ নিজেকে খুব হালকা লাগছে। আর হয়ত দেখা হবে না আমাদের। এই বলে পরমব্রত দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল।"

অমৃতা বলল, "হ্যাপি জার্নি"। পরমব্রত এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকে গেল। অমৃতা গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়িও আবার চলতে শুরু করল। রাতের রাস্তা খুব ফাঁকা হয়ে গেছে। দূরে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আকাশের সব মেঘ কেটে গেল। অমৃতার কেন জানিনা আজ খুব ভাল লাগছে। তবু কেন জানিনা কোত্থেকে গাল বেয়ে জলের ধারা পড়তে লাগল। যেন তার মধ্যে জমে থাকা বহু দিনের কালো মেঘেরা ভিড় করে বৃষ্টি নামাল। সে যে ঠিক মানুষ তা কেউ বুঝতে পেরেছে। এই প্রশান্তি আর কোথায় পাবে সে। অমৃতার বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। রিন্টু বলল, "ম্যাডাম এসে গেছি। আজ অনেক দেরী হয়ে গেল বাড়ি যাই ম্যাডাম।" অমৃতা আর কথা না বাড়িয়ে বলল, "সাবধানে যেও।" এই বলে নিজের ব্যাগ থেকে চাবি বার করে বাড়ির দরজা খুলে ঢুকতেই হঠাৎ করে অরূপ জড়িয়ে ধরে বলল, "হ্যাপি অ্যানিভার্সারি।" অরূপ দেখল অমৃতার চোখে জল। সে বুঝল না। বলল, "আরে তুমি কাঁদছ? আমি তো এসে পরেছি। তাও মন খারাপ?" আজ বৃষ্টির জলের সাথে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল অমৃতার। আর তখনি ঢং ঢং করে ঘড়িতে বারোটা বাজল। আজ তার বিবাহ বার্ষিকী। পঁচিশ বছর এক সাথে পথ হেঁটেছে। অমৃতা চোখ মুছে বলল, "তুমি কখন এলে? এখনও তোমার ছেলেমানুষী গেল না।"

"কেমন সারপ্রাইজ দিলাম।"

"সত্যি তুমি পার বটে এই বয়সে।"

"আমার ফোন নম্বরটা দেখনি? তোমাকে ফোন করলাম, কলকাতার নম্বর তো?"

"এতটা খেয়াল করিনি। ইস সত্যি খুব ভুল হল।"♦♦♦

একটি বাল্বের আত্মকথা

সম্রাট সেন

স্বচ্ছ কাঁচে তৈরী আমার দেহ,
কিন্তু রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে আমাকে হয়ে উঠতে হয়-
কখনো বা লাল বা নীল বা কখনো হয়তো সাদা,
দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য;
তাতে আমার ইচ্ছার কোন স্থান নেই;
কেউ হয়তো প্রয়োজনই মনে করে না জিজ্ঞাসার।
অন্তরের তারজালিকে প্রতিমূহুর্তে পুড়িয়ে আলো ছড়াই আমি,
তোমাদের আলোকিত করার জন্য,
তাতেও হয়ত ভ্রুক্ষেপ করে না কেউ আমায়।
এইভাবে একদিন যখন আমি অকর্মণ্য হয়ে পড়ি,
পারি না আলো ছড়াতে আর;
আমার স্থান আমায় ছাড়তে হয়।
টেনে-ছিঁড়ে-উপড়ে ফেলা হয় আমায়,
স্থান হয় সেই ভাঙ্গা প্যাকিং বাক্স বা ডাস্টবিনের কোণ,
কেউ মনে রাখে না তখন আমায়।
কিন্তু সেই ফেলে দেওয়া ভাঙা কাঁচ কখনও ক্ষতের কারণ হয়-
রক্তাক্ত করে দিতে পারে মানুষ তথা সমাজকে,
সে কথা মানুষ বুঝবে কবে?

কবে বৃষ্টি নামবে

শুভঙ্কর বিশ্বাস

আমি একপশলা বৃষ্টি চাই;
আর পাশে তোমাকে।
বিশ্বাস করো,
সে দিনের পর থেকে আমি দিন গুনছি;
কবে বৃষ্টি নামবে,
তোমাকে নিয়ে।

আমার জানালার কাঁচ বৃষ্টি ভেজা;
এক ঘেমে ওঠা ঝাপসা কাঁচ।
হাতের উপরে হাত, দুটো উষ্ণ হাত;
পাশাপাশি দুটো ডান হাত ছাপ।

জলবাস্প উবে দিয়ে করা এক স্বচ্ছ ছাপ,
থেকে যাক, ওই ঘোলাটে কাঁচে;
তোমার আমার ভালবাসার জীবাশ্ম;
এক জীবন্ত জীবাশ্ম।

ডুয়ার্সের দুয়ারে

সোমা মজুমদার

'আহা কি আনন্দ, আকাশে বাতাসে'
কোথাও ঘুরতে যাওয়ার কথা হলেই, এই গানটাই সর্ব প্রথম গেয়ে ওঠে মন।

তখনও ট্রেনের রিজারভেসন পাইনি। আদৌ যাওয়া হবে কিনা তাই নিয়ে দ্বিধার পাহার জমা হচ্ছে। তবুও যাওয়া হল অবশেষে। উত্তরবঙ্গ, এই নামটার মধ্যেই জড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মাদকতা। আমাদের এবারের গন্তব্য ছিল একসাথে পাহাড় এবং জঙ্গল। এই দুয়েরই প্রতি আমার ভালবাসা অগাধ, গভীর। কাঞ্চনকন্যা এক কুয়াশামাখা ভোরে নিউ জলপাইগুড়ি ষ্টেশন ছুঁলো। গাড়ি আগেই বলা ছিল। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ষ্টেশনে প্রতীক্ষারত ছিল। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল বিন্দুর 'শিভাজি ইন'। কতদিন পর এত সবুজ প্রত্যক্ষ করলাম। মনটা ভরে উঠল। সমতল ছেড়ে পাহাড়ি পথ শুরু হল। সাপের মত পথ চলছে এঁকে বেঁকে। কখনও গভীর জঙ্গল রাস্তার পাশে, আবার কখনও অগভীর। যতই সামনের দিকে এগোচ্ছি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রকৃতির অপরূপ শোভা। যেন আর একটু এগোলেই ছুঁয়ে ফেলতে পারব দূরের ওই নীল আকাশটাকে। কুয়াশা ভেঙ্গে সূর্য রশ্মি দেখা দিচ্ছে অল্প অল্প। যেন ঘুম ভেঙ্গে ওঠা কোন শিশুর হাসি। আমার সবথেকে প্রিয় পাহাড়ের ওই সর্পিল সরু রাস্তা। কি এক অদ্ভুত উত্তেজনা, উন্মাদনা ঘিরে রয়েছে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে। কত দুর্ঘটনা, ধ্বস ঘটে গেছে, তবুও প্রকৃতির দুর্নিবার আকর্ষণ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকে অবিরত অনবরত সবুজের সমুদ্রে সাঁতার দিতে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই টান আবহমান। এক পাশে খাড়া পাহাড়, কোথাও ছোট ঝর্ণা, কোথাও বা বিশালাকার পাথরের চাঁই, আর এক পাশে খাদ। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা পার করে আমরা বিন্দু পৌঁছলাম। পৌঁছেই কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে

হল। কলকাতার যেখান থেকে ঘর আর গাড়ি বুক করেছিলাম তারা বলেছিল ড্রাইভারের থাকার ব্যবস্থা ওরা করে নেবে। কিন্তু বিন্দু পৌঁছে ড্রাইভার বলল ওর থাকার ব্যবস্থা করা নেই। ইনের ম্যানেজারও ড্রাইভারের থাকার ব্যবস্থা করতে রাজি হল না। ওদের সাথে যোগাযোগ করেও তেমন কোন লাভ হলনা। সেই সব সমস্যা কাটিয়ে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারতেই কেটে গেল দুপুরটা। ৩টে তেই বেশ শুনশান হয়ে গেল পাহাড়ি রাস্তা। সেই রাস্তায় হাঁটতে সময়ও লাগে বেশি। ড্রাইভারকে বলা হয়েছিল দুপুরে খাবার পর গাড়ি করে আশপাশটা ঘুরব। কিন্তু ড্রাইভারকে পাওয়া গেলনা। গাড়ি রেখে সে বেপাত্তা। মোবাইলেও তাকে ধরা গেলনা। তাই হাঁটাই শুরু করলাম। কিছুটা হাঁটতেই পৌঁছে গেলাম ভুটান বর্ডারে। বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল, পাশের সবুজ বিশাল পাহাড়টা পেরলেই পৌঁছে যাব ভুটানে। আঞ্চলিক লোকের মুখে শুনলাম এই পাহাড় ডিঙিয়েই ব্রিটিশ ভারতে প্রচুর মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে যেত। পাশ দিয়েই বইছে গুরুগম্ভীর জলঢাকা। তার ডাক কর্ণ কুহরে প্রবেশ করছে বেশ দূর থেকেই। ভুটান বর্ডারের কাছে মোবাইল নেটওয়ার্ক থাকেনা বেশিরভাগ সময়েই। সমতল থেকে, চেনা জগৎ থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র মনে হচ্ছিল নিজেকে। ওখানে ছবি তোলা নিষেধ। মিলিটারি ক্যাম্প রয়েছে পাশেই। সবুজ পোশাকের মিলিটারি হাতে ক্যামেরা দেখলেই চেঁচিয়ে উঠছে। পাশের মাঠে ভলিবল কোর্টে চলছে তাদের খেলা। কাছেই একটা চায়ের দোকান। দোকানের সামনে ছোট ছোট কাঠের বেঞ্চি বসার জন্য, কিন্তু সমতলের মানুষ যারা প্রকৃতির শোভা দেখতে এতদূর এসেছে কষ্ট করে, তাদের কেউই বেঞ্চে বসে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক নয়। দেখলাম চায়ের দোকানটাতে শুধু চা নয়, সাথে কেক, চিপস প্রভৃতি জিনিষও বিক্রি হচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে বেশ দেরি হয়ে গেল। সূর্যের আলো প্রায় ফিকে হয়ে আসছিল। ঠাণ্ডাটাও আরও বেশি করে বোঝা যাচ্ছিল। সোয়েটার ভেদ করে ঠাণ্ডা হাওয়া তার হুল ফুটিয়েই চলেছে। এবার ফেরার পালা। রাস্তায় দেখলাম দুজন নেপালী মহিলা সোয়েটার, টুপি আরও নানারকম ঘর সাজাবার সব সামগ্রী বিক্রি করছে। একটা বড় ঘণ্টা কিনলাম। যেটা সব সময়েই আমার খুব পছন্দের জিনিস। আলো শেষ হয়ে এল, আর সাথে আমাদের পথটাও। বিকেলে ড্রাইভারের দেখা মিলল। তাকে যেই বলা হল গাড়ি নিয়ে ঘোড়াবার কথা ছিল এবং তার না জানিয়ে চলে যাবার কারণ জানতে চাওয়া হল সে তর্ক ও অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার শুরু করল। উত্তরবঙ্গের

মানুষের সম্পর্কে ভালো কথাই শুনে এসেছি এতদিন, তাদের ভালো বলেই জানতাম, তাদের থেকে এমন ব্যবহার আশা করিনি। এ কি ঝামেলা রে বাবা! সমস্যা তো পিছু ছাড়ে না। মনটা কু ডেকে উঠল। ঘরে এসে ঠাণ্ডা বিছানায়, বরফ শীতল লেপের মধ্যে বসে সেগুলোর দেহের উষ্ণতায় উষ্ণ হবার অপেক্ষা, আর সাথে পাশ থেকে ভেসে আসা জলঢাকার গর্জন। রাত বাড়ার সাথে সাথে নিস্তব্ধতা বাড়তে লাগছিল, আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে জলঢাকার ডাকও।

'এই শহর থেকে আরও অনেক দূরে'

পরের দিন ছিল খ্রিষ্টমাস। কলকাতায় থাকলে কেক খাওয়া হত, কিন্তু ওই দূর প্রান্তে সে সবের আর সুযোগ হলনা। সকালেই প্রকৃতির নৈস্বর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে বেড়িয়ে পরলাম। বিন্দু থেকে নেমে ঝালং, চালসা হয়ে গেলাম সামসিং আর সুনতালেখোলা। সুনতালেখোলা ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার লেকের লিলিপুলে দাঁড়ানোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। এইবারের সফরে প্রথম থেকেই অল্প বিস্তর ঝামেলা জড়িয়ে ছিল। ব্রিজ দেখে নামার সময় আসাবধানতা বশত পড়ে গিয়ে পায়ে বেশ চোট লাগল। তবুও ওই ভাবেই গোটা সফরটা কাটালাম। ওখান থেকে গেলাম মূর্তি নদীতে। বাংলা চলচ্চিত্রে অনেকেই এই নদী দেখে থাকবে। মূর্তির ঠাণ্ডা জলে হাত ছোঁয়ানোর অনুভূতি অন্যরকম। এক স্বর্গীয় শীতল স্পর্শ যেন। তার পরের দিনের গন্তব্য চাপরামারি অভয়ারণ্য। এই সফরের এক মুখ্য বিষয় ছিল জঙ্গল পরিভ্রমণ বা বলা যেতে পারে প্রধান আকর্ষণ। তবে মাঝ রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় বেশ অনেকটা সময় জঙ্গলের মধ্যে কাটাতে হল। প্রথম দিকে খানিকটা বিরক্তি লাগলেও ওই নির্জন পরিবেশটাও বেশ উপভোগ্য। চাপরামারি তুলনায় ছোট। টিকিটের মধ্যে গাইডের টাকাটাও ধরে নিয়েছিল, কিন্তু সাথে যে গাইডকে দিয়েছিল তার থেকে আমি বেশি জানতাম। সে ওয়াচটাওয়ারটার নামটাও ঠিক করে বলতে পারলনা। বোঝা গেল এটা শুধুমাত্র এদের রোজগারের ব্যবস্থার জন্য। ওখানকার ঈগল ওয়াচটাওয়ারটাও খুব বড় না। তবে সবুজ প্রকৃতির মধ্যে মন খুলে শ্বাস নেওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। সাথে দু চোখে সবুজ কাজল পরে নেওয়া। প্রকৃতির সাথে বধুত্ব করতে চাইলে জঙ্গলের কোন বিকল্প হয়না সেটা আরও একবার মনে প্রাণে অনুভব করলাম। খুব দূরে দেখা যাচ্ছিল নুন জলের কুয়ো। যার কাছে বনের প্রানীরা এসে
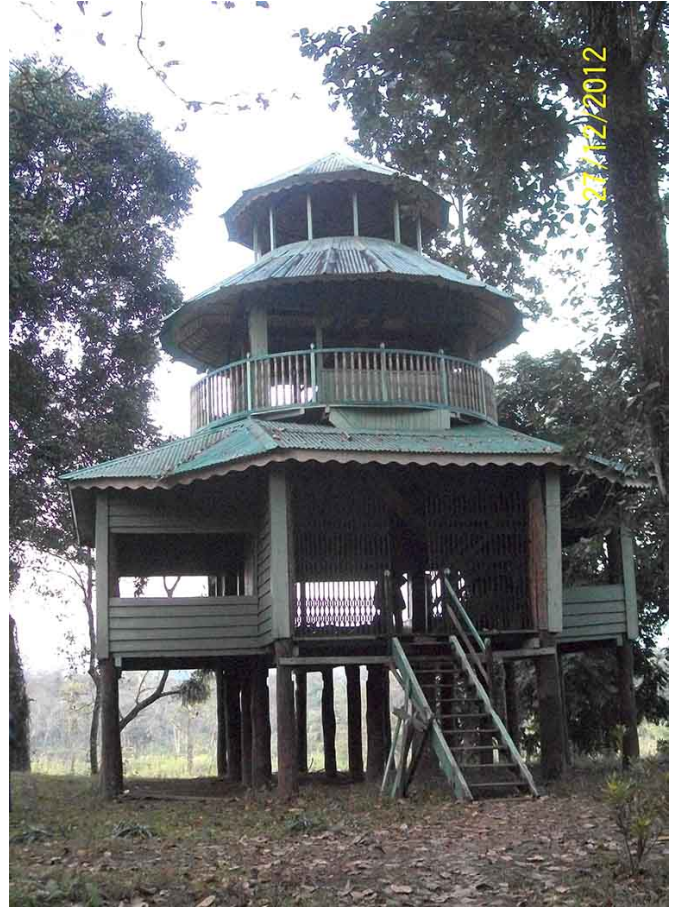
জল খায়। দূর থেকে হরিন আর বাইসনের দর্শন পেলাম। সেদিন সন্ধ্যে বেলায় ঘটল এক ঘটনা। একে ঠিক অঘটন বা দুর্ঘটনা বলব কিনা জানিনা। কারণটা পরে বলছি। সন্ধ্যায় সরাইখানার ম্যানেজার এসে জানাল পরশু ভোর থেকে বিন্দুর সাথে সমতলের সংযোগ রক্ষাকারী ব্রিজের মেরামতের কাজের জন্য ব্রিজটি খোলা হবে। সেদিন আমাদের চলে যাবার কথা। কিন্তু এত ভোরে যাব কি করে। তাই ঠিক হল পরের দিন সকালে সমতলে কোন রিসোর্টে থেকে তার পরের দিন ফেরার ট্রেন ধরব। স্থানীয় মানুষের থেকে অবশ্য ব্রিজ খোলার কোন খবর পাইনি। অনেকেই বলল ম্যানেজার মিথ্যে বলছে। খুব খারাপ লাগল। এতবার পাহাড়ে গেছি, পাহাড়ের লোকের সহজ, সরল ব্যাবহারই পেয়েছি সবসময়। এমন ব্যাবহারে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। মনে হল শেষমেশ বাড়ি ফিরতে পারব তো। পরের দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। সেটা আবার বিন্দুর পাহাড়ে হাট বসার দিন। কলকাতার চেতলায় হাট বসতে দেখেছি স্কুলে পড়তে। তবে পাহাড়ের কোলে এ হাট রীতিমত তাক লেগে যাবার মত। ঘর সাজাবার জিনিষ, শীত পোশাক, জুতো আরও হরেক রকমের জিনিসের সমাহার। লোকও এসেছে প্রচুর। সমতল থেকে এসেছে অনেক মানুষ তাদের জিনিষ নিয়ে। দেখলাম

অনেক ভুটানের লোকজনও আছে। এ হাট বড় রঙিন। খাবার জিনিষও বিক্রি হচ্ছিল অনেক রকম, অনেক গুলোর নাম যদিও আমার জানার মধ্যে ছিলনা। স্বাদ সবগুলোর মনের মত নয়, তবুও প্রথম বার নতুন কিছু আস্বাদন করার একটা আলাদা আনন্দ থাকে। বিন্দুকে বিদায় জানিয়ে নেমে এলাম সমতলে। বিন্দু পিছনে ছোট হতে হতে বিন্দু হয়ে গেল। গরুমারার কাছে টিয়াবন রিসোর্টে গিয়ে উঠলাম। রিসোর্টটি অসাধারণ। চোখ জুড়িয়ে যায় ফুলের বাহার দেখে। প্রাকৃতিক পরিবেশও বেশ মনোরম। এবার বলি পূর্বে বিন্দু থেকে মাঝ পথে চলে আসার ঘটনাটাকে কেন দুর্ঘটনা বলতে আপত্তি ছিল। গরুমারা দেখার ইচ্ছে শুরু থেকেই ছিল। কারণ জঙ্গল সাফারির আলাদা একটা আকর্ষণ শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু গরুমারা দেখে বিন্দু পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যেত। রাতে পাহাড়ি রাস্তায় যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইলনা কেউ। তাই একরকম ওটা সফর থেকে বাদ পড়তেই চলেছিল। টিয়াবনে আসার কারণে সেটা আর বাদ দিতে হলনা। রিসোর্টে ২টো ঘর নিয়ে সব জিনিষ রেখে গরুমারার দিকে রওনা হলাম। গরুমারার নিয়ম হল জঙ্গলের কয়েকটি ওয়াচ টাওয়ারের মধ্যে যে কোন একটা বেছে নিয়ে তার টিকিট কাটতে হয়। আমরা বেছেছিলাম 'চুকচুকি ওয়াচ টাওয়ার'। টিকিটের সাথে গরুমারা ফরেস্ট ক্যাপ, বেশ ভালো কয়েকটা বন্য প্রানীর ছবি দিল। আমি একটা বই কিনলাম 'ডুয়ার্সের পাখি' নামে আর কিনলাম ডুয়ার্সের জঙ্গলের ১টা ডিভিডি। জঙ্গল সাফারির পর আদিবাসী নৃত্য দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। হুড খোলা জিপসিতে করে নিঝুম পরিবেশের মধ্যে ছুটে চলা সে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির সবুজে দু চোখ সতেজ হয়ে ওঠে। জঙ্গলের এক নিজস্ব ভাষা আছে, সেটা অনুভব করতে হয়। কখনও খালি চোখে, কখনও বাইনোকুলার আবার কখনও ক্যামেরার চোখ দিয়ে চলতে লাগল জঙ্গলের স্পর্শ গায়ে মাখা। যাবার পথে খুব কাছ থেকে বাইসনের দেখা পেলাম। বন থেকে বেরিয়ে গাড়ির খুব কাছে চলে এসেছিল। কিন্তু যাত্রীদের চিৎকারে ভয় পেয়ে বেচারা আবার বনের ভেতরে নিরাপদে পালিয়ে গেল। অবশেষে গিয়ে পরলাম ওয়াচ টাওয়ারে। জঙ্গলের গভীরের শিহরণ আবিষ্ট করে তোলে প্রতি মুহূর্তে শরীর ও মনকে। নানা রকম পাখির ডাকে মুখরিত হচ্ছিল আকাশ, বাতাস। মুহূর্ত গুলো অসাধারণ রোমাঞ্চে ভরে উঠছিল। সময় বাঁধা। প্রকৃতির সান্নিধ্যে দীর্ঘক্ষণও মুহূর্তের মত লাগে, আর এত কিছু ঘণ্টা মাত্র। অতএব সূর্যের আলো পৃথিবীকে বিদায় জানানোর সাথে সাথেই জঙ্গলকে বিদায় জানিয়ে আমরাও চলে এলাম আদিবাসী গ্রামে, আদিবাসী নৃত্য দর্শন করতে। সেও এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। আমার জীবনে এমন নৃত্য দেখার অভিজ্ঞতা এত কাছ থেকে এই প্রথম। প্রত্যেকে কি পারদর্শী এবং দক্ষ শিল্পী তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

সন্ধ্যায় বন যেন আরও গভীর। গাড়ির হেড লাইটে বন হয়ে ওঠে রহস্যময়ী। তার সৌন্দর্যও দিনের সৌন্দর্যকে হার মানায়। রিসোর্টে পৌঁছে দেখলাম সেখানে ক্যাম্প ফায়ারের বিশাল আয়োজন। সেখানেও আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করতে শিল্পীরা হাজির। ওদের সাথে পায়ে পা মেলানোরও সুযোগ পেয়ে গেলাম সাবার সাথে। রিসোর্টের অনেকেই উঠে এসে ওদের সাথে নাচের তালে পা মেলাল। সেও এক নতুন ও স্মরনীয় অভিজ্ঞতা। নাচের স্কুল ছাড়ার পর এই আবার নাচলাম কোথাও। বেশ লাগছিল। পরের দিন ভোরে ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পরলাম। হাসিমারা থেকে ট্রেন। তাই জয়গাঁ হয়ে ভুটানের প্রবেশ দ্বার পেড়িয়ে ফুন্টশিলিং মনেস্ট্রিটা চোখের দেখা দেখে নিলাম। পথে পড়ল দু পাশ জুড়ে বিশাল বিশাল সমস্ত চা বাগান। পাহাড়ের কোলে তুষার শুভ্র মনেস্ট্রি, অতুলনীয় তার সৌন্দর্য। চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। অবশেষে ট্রেনে চড়ে বসা। আবার ফিরে আসা আমার সেই প্রিয় চলমান শহর কলকাতার বুকে রোজকার জীবনে।

রামধনু

অঙ্গনা সেনগুপ্ত

যাক বাবা! বাঁচা গেল। আর কোনও চিন্তা নেই। এবার স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারবে মৌ। এইকমাস যা ঝক্কিটাই না যাচ্ছিল ওর। সারাদিন মায়ের ঘ্যান ঘ্যান আর বাবার তর্জন গর্জন। আর পেড়ে ওঠা যাচ্ছিল না। এটাই ভাল হল। মাস চারেক আগে থেকে মৌয়ের জীবনটা একেবারে পাতি ভাষায় যাকে বলে হেল হয়ে গেছিল। ঠিকঠাকই চলছিল সব। কিন্তু ওই সবকিছু জানাজানি হয়েই ব্যাপারটা ঘেঁটে গেল।

পিঙ্কুটা যে এমন ভুল কি করে করল আজও মৌ বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ করে দিল্লি থেকে চিঠিটা না পাঠালে যেন তার চলছিল না! ফোনে কানেকশান না থাকায় কথা হচ্ছিল না। আর পিঙ্কু যেমন অধৈর্য্য তাতে ওর আর তর সইল না। তাই দুম করে চিঠিই লিখে বসল হাঁদাটা। একবার ভাবলও না অন্যের হাতে পড়লে কি হবে? আর ঠিক সেটাই হল। প্রেমপত্র মৌ আগে কখনও পায়নি পিঙ্কুর কাছ থেকে। ইচ্ছে তো অবশ্যই ছিল। নিজেও আগে অনেকবার পিঙ্কুকে প্রেমপত্র দিয়েছে। কিন্তু পিঙ্কু কখনও দেয়নি। যা আনরোম্যান্টিক পিঙ্কুটা! তা আনরোম্যান্টিকই না হয় থাকত। এইরকম একটা বোকামি করার কোনও মানে হয়!

আর মৌয়ের বাবারও ঐ এক বাজে স্বভাব। চিঠি যার নামেই আসুক না কেন সেটা খুলে পড়া চাইই। ব্যাস! জানাজানি হয়ে গেল ওদের সম্পর্কটার কথা। এতবছর এভাবে লুকিয়ে বাঁচিয়ে প্রেম করার পর এভাবে ধরা পরে যাবে ওরা, সেটা মৌ দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। তারপর আর কি! যা হবার তাই হল। বকাবকি বাড়িতে। বাবার রাগ আর মায়ের কান্না! দুজনের কেউ মানতেই পারছিল না যে তারা মেয়েকে এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। প্রেম করার শিক্ষা। বনেদি বাড়ির মেয়েদের যে প্রেম করতে নেই সেই শিক্ষাটা তারা ঠিকঠিক দিয়ে উঠতে যে একদম গোহারা হেরেছেন সেটা দুজনেই মানতে পারছিলেন না। রায় বাড়ির মেয়ে ভালবাসছে! তাও নাকি আবার একটা মেয়েকে! এও যে সম্ভব সেটা ভাবতেই পারেননি তারা প্রথমে। ব্যাস! অশান্তি শুরু। বকাঝকা, মার, সর্বদা নজরদারি করা মেয়ের ওপর কিছুই বাদ রইল না। পিঙ্কুর সাথে সবরকম যোগাযোগই প্রায় বন্ধ। ওরা ভেবেছিলেন এতেই বোধহয় কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু পিঙ্কুও যে এতটা নাছোড়বান্দা টাইপের মেয়ে সেটা ওরা ভাবেননি। মৌয়ের কাছ থেকে সবকথা শুনে নিজেই হঠাৎ একদিন চলে এসেছিল। এসে নির্ভয়ে কাকু কাকিমার সামনে ঘোষণা আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালবাসি। তোমরা কি ভালবাসা বোঝোনা? মৌয়ের সাথে এইরকম করছ কেন? পিঙ্কু যে এতটা সাহস দেখিয়ে ফেলবে সেটা মৌয়ের বাবা মা কল্পনা করে উঠতে পারেননি। ওইটুকু একটা পুঁচকে মেয়ে এইভাবে বাড়ি এসে অপমান করে যাবে সেটা কি আর হজম হয় কারও? পিঙ্কুর বাড়িতেও পৌঁছল তাদের মেয়ের কীর্তিকলাপের সংবাদ। সে বাড়িতেও সবার মাথায় বাজ পড়ল। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা একটু পুরুষালি ছিল বটে। কিন্তু তাই বলে এই বদনাম! আরেকটা মেয়েকে ভালবাসবে? তারপর আর কি? দুই বাড়ির মধ্যে বেশ একটা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলতে থাকল। আর মৌ? সেইদিনের সেই প্রেমপত্রটা কুড়িয়ে নিয়েছিল ও। পিঙ্কুর দেওয়া প্রথম চিঠি। পিঙ্কুটা যে এতটা রোম্যান্টিক হতে পারে সেটা ও জানত না। আর পিঙ্কু ওদিকে মৌয়ের জন্যে সবার সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিল। সে হার মানার পাত্রী নয়। সবাইকে বোঝাতে লাগল এটা আর পাঁচটা প্রেমের মতই স্বাভাবিক। শুধু ওরা একে অপরের সন্তান ধারণ করতে পারবে না, কিন্তু তাতে কার কি এলো গেল? ওরা তো একসাথে থাকবে, খুশি থাকবে সেটাই কি দুই পরিবারের জন্যে যথেষ্ট নয়? যদিও পিঙ্কু তার কোনও প্রশ্নের উত্তরই পায়নি।

প্রায় মাস দুয়েক পরে দুই বাড়িতেই ঘোষণা হল যে তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র দেখা শুরু হবে। দুজনেই নাকি কাঁচা বয়সে কাঁচা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। এইরকম একটা আধটা ভুল সবারই হয়। তাই তারা যেন পুরনো কথা ভুলে বিয়েতে মন দেয়। ভালো ছেলের সাথে ভাল "সম্পর্ক" গড়ে উঠলে ওদের এই ফেসটা নাকি কেটে যাবে। বেশ জোরকদমে তোড়জোড় শুরু দু'বাড়িতেই। পিঙ্কুর তো বিয়ে একরকম পাকাই হয়ে গেল। বোধহয় মাসখানেকের মধ্যেই দিন ঠিক হয়ে যাবে। মৌয়েরও হবে হবে করছে। সব সমস্যার এত সহজ সমাধান জুটে যাওয়ায় সবাই একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছে। কিন্তু দুই মেয়ের প্রাণের কথা কেউ বোঝার চেষ্টাও একবার করেনি। শুধু মৌয়ের দাদাই যা ওদের মধ্যে একটু যোগাযোগের উপায়।

তবে ওরা তো মোটেই কম ভালোবাসেনি একে অপরকে। এত সহজে হারবার পাত্রী ওরাও নয়। তাই ঠিক হল পালিয়েই যেতে হবে। যারা ওদের বোঝেনা তাঁদের জন্য এত ভেবে লাভ কি? তাই পালিয়ে যাওয়াই সেরা উপায়। মৌ যদিও কিন্তু কিন্তু করছিল। মেয়ে বলতে বাবা মা দুজনেই পাগল কিনা। শরীর খারাপ করে যদি? পিঙ্কু আর দাদা অভয় দিয়েছিল। আর যেমন ভাবা সেই মতন প্ল্যানও হয়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে দিনটাও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু সেও গেল ভেস্তে। ফোনের কথাগুলো সেদিন কিভাবে যেন পিঙ্কুর বাবা শুনে ফেলেছিলেন। শুনেই তাড়াতাড়ি ভীষণ কড়াকড়ি শুরু হল মেয়ের উপর। মেয়ের বিয়ের দিনটাও ছেলের পক্ষকে বলে একমাস এগিয়ে আনা হল। পিঙ্কুকে ওর বাবা সুইসাইডের ভয়ও দেখালেন।

এদিকে মৌয়েরও বাড়ির বাইরে বেরনো একদম বন্ধ। এর মধ্যেই খবর এলো পিঙ্কুর বিয়ে আসছে শনিবার। খুব কষ্ট হচ্ছিল মৌয়ের। নিজের থেকেও বেশি পিঙ্কুর জন্য বেশি কষ্ট হচ্ছিল। পাগলের মতো ভালবাসে মেয়েটা ওকে। ওকে ছাড়া বাঁচবে কি করে পিঙ্কু? আর মৌ নিজেই বা কি করে বাঁচবে? এই দিনটা যে খুব একটা অসম্ভব না সেটা জানত মৌ। সমকামী সম্পর্ক তো এতসহজে মেনে নেবে না সমাজ। কিন্তু বরাবর পিঙ্কু অভয় দিত। আর আজ সেই পিঙ্কুরই বিয়ে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল পিঙ্কুকে একবার দেখার। শেষবারের মতো। কিন্তু কোনও উপায় নেই। মা বলেছে পিঙ্কুর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিও যাওয়া যাবে না।

দেখতে দেখতে দিনটা এসেই গেল। আজ শনিবার। পিঙ্কুর বিয়ে। মেয়েটা কি রঙের শাড়ী পড়েছে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল খুব মৌয়ের। মেয়েটা সাজে খুব কম কিন্তু সাজলে মনে হয় যেন ডানাকাটা পরী। আর কোনোদিন ওকে দেখতে পারবে না মৌ। নিজের করে কাছেও পাবে না। এসব ভেবে ভেবে কাল থেকে একবারও চোখের পাতা এক করতে পারেনি মৌ। শুধু ওকে একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। কি করা যায় সেটাই ভেবে চলেছিল কাল থেকে।

তবে সেই দেখাটা যে এই ভাবে হয়ে যাবে ভাবেনি মৌ। কি অপূর্ব সুন্দর লাগছিল পিঙ্কুকে লাল বেনারসি শাড়ীটাতে। ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করছিল খুব মৌয়ের। পিঙ্কুর ঠিক পাশে গিয়ে বসেছিল মৌ। আজ ওকে কেউ আটকায়নি পিঙ্কুর কাছে যেতে। পিঙ্কুর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছিল মৌ। হাত লাগিয়ে বুঝেছিল ওর নিথর দেহটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গলায় ফাঁসটা ঠিকঠাকই লাগিয়েছিল পিঙ্কু। মৌ একটুও কাঁদেনি। চুপচাপ ওকে দেখে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

দাদা কিসব বোঝাবার চেষ্টা করছিল। বেশ কিছুক্ষন বসে থেকে নিজের ঘরে চলে এসেছিল। ও জানে ওকে কি করতে হবে। পিঙ্কুকে দেওয়া কথাতো ফিরিয়ে নিতে পারে না। শুধু পিঙ্কুটা আবার পাগলামো করল ভেবে খুব রাগ হচ্ছে। এভাবে ওকে রেখে দিয়ে চলে গেল? এসব ভাবতে ভাবতে বছর চারেক আগের তুলে রাখা সেই ডায়েরিটা বের করল মৌ। ওটাতে ব্লেডটা এখনও রাখা ছিল। প্রায় চার বছর আগে ওটা নিজের কব্জির উপর চালিয়ে দিতে চেয়েছিল মৌ। নিজের শরীরের প্রায় প্রতিটা অংশে মাসতুতো দাদার দাঁত আর নখের দাগের যন্ত্রণার থেকে ব্লেডের কাটা যন্ত্রণাটা সহ্য করা অনেক সহজ বলে মনে হয়েছিল মৌয়ের। সেদিন পিঙ্কু না থাকলে এই বাড়তি চারটে বছর পেতনা হয়তো মৌ। ওই পাগল মেয়েটা আটকেছিল বলেই না সেদিন হাতটা কিছুতেই কাটতে পাড়েনি। ভাগ্যিস ফেলে দেয়নি! পিঙ্কুর কাছে যেতেতো এবার এটাই সাহায্য করল। কাটার পর বেশ জ্বালা করছিল বাঁ হাতটা। আর মাথাটা বেশ ঘোরাচ্ছিল। ঠিকঠাক ভাবে কাটা হয়েছে কিনা তাতে সন্দেহ ছিল একটু। কিন্তু এখন নিজের দেহটার পাশে দাঁড়িয়ে মৌয়ের আর কোনও সন্দেহ নেই। একটু পড়েই দাদা বা মা কেউ এটা দেখবে হয়তো। দাদাটা খুব কাঁদবে বটে তবে বুঝবে নিশ্চয়ই। পিঙ্কুর কাছে তো ওকে যেতেই হত।

দেহটার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল মৌ। পাশেই পিঙ্কুও দাঁড়িয়ে দেখছিল মৌয়ের বডিটাকে। মৌয়ের দিকে তাকিয়ে এবার একটু মুচকি হাসল। উফ্, কি মিষ্টি হাসিটা। এই হাসিটার জন্যই শেষমেশ প্রাণটাও গেল! মনে মনে ভেবে মৌও হাসল। আর চিন্তা নেই। সত্যিই সব মিটমাট হয়ে গেল আজ তাহলে। আর কোনও বাঁধা নেই। কেউ বাঁধা দেবারও নেই। এবার ওরা থাকতে পারবে একসাথে নিজেদের আপন স্বর্গে। মৌয়ের ফোনের রিংটোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো।

When the distances grow,
When the winds start to blow,
Something whispers from afar-
There's a home in the heart.
Another Heaven!
There's a time for everything,
There's song for every dream
There's a world that's yet to be!

(সত্যি ঘটনা অবলম্বনে)

মানিক রাজার দেশে

দীপান্বিতা ভট্টাচার্য্য

চোখে পড়তে সূর্যের আলো ভাঙল যখন ঘুম,
চেয়ে দেখি চারদিকে গভীর জঙ্গল, নিস্তব্ধ নিঃঝুম।
ভয়ে আতঙ্কে চমকে উঠে হাত পা যখন অসাড়,
হঠাৎই এক অদ্ভুত শব্দ হল কর্ণগোচর।
অনুসরণ করে সেই শব্দ এগিয়ে গেলাম গভীর বনে,
চমকে দেখি স্বয়ং প্রফেসর শঙ্কু কর্মরত একমনে।
প্রশ্ন করলাম 'প্রফেসর আপনি এখন এই স্থানে?
এদিকে সারা বিশ্ব ছুটে বেড়াচ্ছে আপনারই সন্ধানে'।
বললেন তিনি 'বিশেষ এক গবেষণা চলছে অরণ্যমাঝে,
সফল হলেই তা ব্যবহৃত হবে মানুষের কল্যাণ কাজে।
ততদিন পর্যন্ত আমার কথা বোলো নাকো কাউকে,
এই গবেষণা সমাপ্ত হলেই আমি আসব সবার সম্মুখে'।

তিনিই আমায় প্রদর্শন করলেন বাইরে যাওয়ার পথ,
যাতে আমি লোকালয়ে পৌঁছাই এড়িয়ে সকল বিপদ।
জঙ্গল পেরোতেই অভিভূত হলাম মনোরম কাশবনের শোভায়,
হঠাৎ দেখি সেখানেই বসে অপু-দুর্গা রেলগাড়ির অপেক্ষায়।
ডাকতে যাব তাদের, তখনই কানে এল এক সুর ভেসে,
এতো সেই চিরপরিচিত গান 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'।

গুপী বাঘার সাথে পরিচয় আর গল্প হল মেলা,
এরপর এল স্বচক্ষে তাদের যাদু দেখার পালা।
সামনে এল মণ্ডা মিঠাই তাদের করতালির জোরে,
তিনজনে মিলে খোশ মেজাজে খেলাম তৃপ্তি করে।
রসনা তৃপ্তিতে প্রশ্ন করলেন তারা, কোথায় আমার বাড়ি?
আমায় নিয়ে নিমেষের মধ্যে দেবেন সেখানে পাড়ি।
হঠাৎই আমি করে বসলাম অদ্ভুত এক আবদার,
যেতে চাইলাম ২১, রজনী সেন রোড, ফেলুদার দরবার।
মূহুর্তের মধ্যে হাজির হলাম গল্পে পড়া সেই ঘরে,
দেখলাম ত্রিমূর্তিতে বসে জটায়ুর পুজোর বই পড়ছে মনযোগ ভরে।
বললাম আমি তাদের পুনরাগমনের আশায় অপেক্ষারত সকলে,
আশ্বাস দিলেন ফেলুদা, পুনরাবির্ভূত হবেন তিনি উপযুক্ত সময় হলে।

আরও অনেক গল্প শুনলাম, মন ভরে গেল খুশিতে,
তারপরেতে বেড়িয়ে পড়লাম, এবার ফিরতে হবে বাড়িতে।
চড়লাম ট্রামে, গন্তব্য বাড়ী, খুশি আমি আজ বড়,
আরও চমক বাকি ছিল, ট্রামে তারিণীখুড়ো।
ছুটে যাব খুড়োর কাছে এমন সময় শুনি,
আমার নাম ধরে ডাকাডাকি, আর সাথে ঝাঁকুনি।
চোখ মেলতেই দেখি আমি শুয়ে আমার খাটে,
আর পাশে...আমার ভুল নয়, আমার মা-ই তো বটে।
এখন আমি উপলব্ধি করলাম অবশেষে,
স্বপ্নের মধ্যেই ঘুরে এলাম মানিক রাজার দেশে।
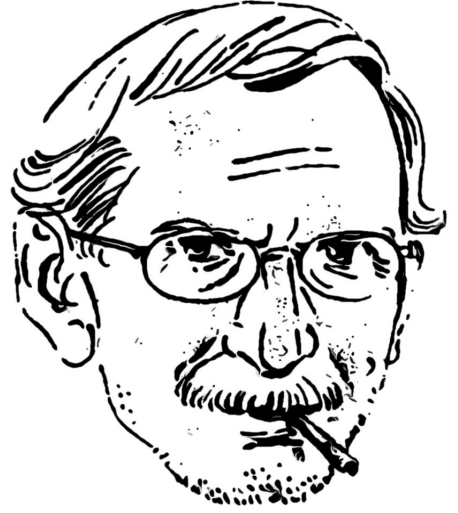
চিত্রগ্রাহক: চিরঞ্জীৎ দাস

১০৮ শিব মন্দির, বর্ধমান

শ্যামলিমা

খাবারের সন্ধানে

বিপদের বন্ধু

উজ্জ্বল দত্ত

গতকাল থেকে মনটন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে বুড়ো রজব আলির। ছেলে তাহের আলির সাথে গতকাল রাত্রে বেশ একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে। তাহেরের সেই কথা, "আব্বা, বুধিকে এবার বিক্রি করে দাও, বুড়ি হয়ে গেছে ও। আর লাভ কি খামোখা ওর পিছনে টাকা খরচ করে?"

তাহেরের মুখে এই কথা শুনে রেগে উঠেছিল রজব আলি, চেঁচিয়ে উঠেছিল, "তুই বলছিস কি তাহের! আজ বুধি বুড়ি হয়ে গেছে বলে ওকে বিক্রি করে দেব? তুই ভুলে গেছিস যে তোর দুই ছেলে মেয়ে ওর দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। এখন ওর বয়স হয়ে গেছে বলে ওকে বেচে দেব, একথা তুই মুখে আনিস কি করে? তাছাড়া ওর এখন বয়স হয়ে গেছে। কতটুকুই বা আর খায় যে ওর খড়-খইলের খরচটা আর বরদাস্ত করতে পারছিস না! আমিও তো মাঠ থেকে ওর জন্য ঘাস নিয়ে আসি, পাতা কুড়িয়ে আনি। বাড়ির ভাতের ফ্যানও খেয়ে নেয়। তাহলে ওকে বেচবার জন্য এত ব্যস্ত কেন তুই?"

তাহেরও রেগে গিয়ে বলে, "দেখ আব্বা, আমার কাছে লুকিয়ো না, শুধু খড়-খইলের খরচ হলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু গত মাসে বুধি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন শহর থেকে ওর জন্য মোটা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার আনাও নি? কলকাতা থেকে দামি ওষুধ এনে ওকে খাওয়াও নি? যত সব ফালতু খরচা আজকালকার বাজারে। তুমি কি পাগল হলে নাকি? পাগল না হলে, কেউ একটা বুড়ি, দুধ না দেওয়া গোরুর পেছনে এত খরচা করে?"

অসুস্থ বুধিকে ডাক্তার দেখানো ও ওষুধ কিনে খাওয়াবার কথা রজব আলি ছেলেকে জানায়নি। মনে ভয় ছিল যে এ ধরনের খরচার কথা শুনলে তাহের রেগে যাবে। কিন্তু এখন

দেখা যাচ্ছে যে তাহের কোনভাবে একথা জেনেছে। তাহেরের মাকে তো রজব আলি এসব কথা পই পই করে তাহেরকে বলতে মানা করে ছিল। সে নিশ্চয় বলেনি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে তাহের যে ভাবেই হোক কথাটা জেনে ফেলেছে। এই গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় রজব অপ্রস্তুত হয়ে আমতা আমতা করতে থাকে। "না, মানে বুঝলি না, ওই একটু আর কি...."

তাহের এরপর কঠিন গলায় বলেছিল, "দেখ আব্বা, ব্যাঙ্কে চাকরি করি বলেই এই নয় যে আমার ঘরে টাকার বস্তা বসানো আছে। কলকাতার বাজারের অবস্থা কি তা এই গ্রামে বসে জানবে কি করে তুমি। তোমার দুই নাতি-নাতনিকে ইংরেজি স্কুলে পড়াতে কত খরচ হয় তার তুমি কি জান? ওখানে গলা কাটা দাম সব কিছুর। আর তার উপর আছে আবার সাবেরার বিয়ের দেনা শোধ। এর মধ্যেও কষ্ট করে পয়সা জমিয়ে গ্রামে পাঠাই যেন তুমি আর আম্মা একটু ভাল ভাবে থাকবে। কিন্তু তোমার এই বুড়ি গোরুর পেছনে সে টাকা যদি এমন ভাবে নষ্ট কর, তাহলে কিন্তু আমারও টাকা পাঠাতে অসুবিধা হবে এর পর থেকে।" এই বলে তাহের উঠে গেছিল বাপের সামনে থেকে।

দু'দিনের ছুটিতে আব্বা-আম্মাকে দেখতে গ্রামে এসেছিল তাহের। সকালের বাসে কলকাতায় চলে গেল। আর সেই সকাল থেকেই বুড়ো রজব আলি মন খারাপ করে বসে আছে। কি করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

(২)

রজব আলি এমনিতে একজন মোটামুটি সঙ্গতি সম্পন্ন চাষি। বেশ কয়েক বিঘে জমির মালিক। নিজে লেখা পড়া বিশেষ জানে না। তবে লেখা পড়ার কদর বোঝে। তাই খুব কষ্ট করে হলেও ছেলে তাহেরকে ও দুই মেয়ে ফতিমা ও সাবেরাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। ছ'বছর আগে বড় মেয়ে ফতিমা ইন্টার পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে, রজবের চাচাজাদ ভাই সিরাজুল একটা ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এসেছিল। পাত্র পক্ষ বেশ বড়লোক। পাত্র নিজে বি.এ. পাশ জমি-জমা-পুকুর আছে, ধান চালের আড়ত আছে। ট্রাকের ব্যবসা আছে।

ফতিমাকে দেখতে সুন্দরী তার উপর আবার ইচ্ছা লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করবে। তাই অত বড়লোকের বাড়ি বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। প্রথম মেয়ের বিয়ে তার উপর আবার বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে। তাই পাত্রপক্ষের চাহিদা বিশেষ কিছু না থাকলেও, রজবের বেশ কিছু খরচা হয়ে গেল ও খানিকটা জমিও বাঁধা পড়ল। সে দেনা শোধ হতে লেগে গেল প্রায় চার বছর।

তারপর গত বছর সাবেরা বি.এ. পাশ করতেই তাহের বোনের জন্য একটা ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এল। ওরই এক সহকর্মীর ভাই। পাত্র ইঞ্জিনিয়ার। রেলে চাকরি করে। সাবেরাকেও দেখতে ভাল। তার উপর পড়াশুনা জানা। তবে পাত্রপক্ষের চাহিদা রজবের সাধ্যের অতিরিক্ত। কিন্তু এত ভাল পাত্র হাতছাড়া করতে রজবের মন চাইল না। ভেবেছিল যে আবার জমি বাঁধা রাখবে।

কিন্তু তখন তাহেরই জমি বাঁধা রাখতে মানা করেছিল। এদিক ওদিক থেকে ধার দেনা করে আর নিজের প্রভিডেন্ড ফাণ্ড থেকে লোন নিয়ে বোনের বিয়ের জন্য টাকার সংস্থান করেছিল তাহের।

ছেলে হিসেবে তাহের এমনিতে ভালই। বি.এস.সি. পাশ করে, ব্যাঙ্কের পরীক্ষা দিয়ে, প্রথম বারেই পাশ করে প্রবেশনারি অফিসার হয়ে ঢুকেছিল তেরো বছর আগে।

তাহেরের বউ ও বি.এ. পাশ ও বড় লোকের মেয়ে হলেও দেমাকি নয়। শ্বশুর-শাশুড়িকে মানে- গণে। রজব নিজের একমাত্র ব্যাঙ্ক অফিসার ছেলের বিয়েতে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারেনি।

তাহের, তাহেরের বউ ও নাতি নাতনি ছুটি ছাটায় গ্রামে আসে। টাকা পয়সাও তাহের যা পারে পাঠায়, বোনের বিয়ের দেনাও কিছু কিছু করে শোধ করছে তাহের। বলা যায় যে ছেলে হিসাবে তাহের নিজের কর্তব্য যথাসাধ্য করছে। তার জন্য কোনও নালিশ নেই রজবের।

কয়েক বছর হল রজব আর নিজে চাষ করে না। সব জমি ভাগ চাষিদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তারা ফসলের যা ভাগ দেয়, তাতে সারা বছরের খোরাকির সংস্থান হয়ে বেশ কিছু উদ্বৃত্তও থাকে।

এভাবে মোটামুটি শান্তিতে বুড়ো বয়েসটা কেটে যাওয়া উচিত রজবের। কাটছিলও তাই। কিন্তু মাঝখান থেকে বাধ সেধেছে ওই বুধি।

(৩)

নিজের ছোটবেলা থেকেই বুধি আছে রজবের সংসারে। নিজের বয়েসকালে কত দুধই না দিয়েছে বুধি। আর সেই দুধের কি স্বাদই না ছিল। তাহেরের দুই ছেলে মেয়েরই বেশ

ভাল স্বাস্থ্য। রজবের দৃঢ় বিশ্বাস যে ছোটবেলায় প্রচুর পরিমাণে বুধির দুধ খাওয়ার জন্যেই তাদের অমন নিটোল স্বাস্থ্য।

রজবের অপত্য স্নেহ পড়ে গিয়েছিল বুধির উপরে। নিজের হাতে বুধির জন্য জাবনা মাখত রজব। মাঠে চড়াতে নিয়ে যেত। মশা তাড়াবার জন্য গোয়ালে ভিজে খড় জ্বালত। শীতের রাত্রে বুধিকে শুইয়ে গায়ে চট চাপা দিয়ে দিত।

বুধি খুশি হয়ে রজবের গায়ে নিজের মাথা ঘষত। বুধির গলায় একটা ছোট পিতলের ঘন্টা বেঁধে দিয়েছিল রজব। বুধি খুশি হয়ে নিজের মাথা নাড়ত আর টুং টাং করে ঘন্টা বাজত।

এভাবে বুধি রজবের বাড়িরই একজন সদস্য হয়ে উঠেছিল। আর তাহেরই কিনা এখন জোর করছে বুধিকে বেচবার জন্য।

গত কয়েক মাস ধরেই বুধির শরীরটা খারাপ হয়েছে। রজব কাছের শহরে গিয়ে মোটা ভিজিট ও যাতায়াত ভাড়া দিয়ে ভেটারনারি ডাক্তার ডেকে এনেছিল।

ডাক্তারবাবু বুধিকে দেখে বলেছিলেন, "তোমার গোরুর তো বেশ বয়স হয়েছে। ও তো আর বেশিদিন নেই। এর পেছনে টাকা খরচ করে লাভ কি?"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে চটে গিয়ে বলেছিল, "বাঁচা মরা তো আল্লার ইচ্ছা ডাক্তারবাবু। আপনি ওকে ভাল করে দেখে একটু ওষুধপত্র দিন। বাকি আল্লার মর্জি।"

"তা বেশ। তোমার যখন এতই ইচ্ছা পয়সা খরচ করার তখন দিচ্ছি ওষুধ লিখে। মাঝে মাঝে খাইও। কষ্ট কম পাবে। তবে যতই ওষুধ খাওয়াও, খুব বেশি হলে আর বছর খানেকই এর আয়ু," বলেছিলেন ডাক্তারবাবু।

কলকাতা থেকে গ্রামের একজনকে দিয়ে ওষুধ আনিয়েছে রজব। বুধিকে নিয়মিত খাওয়াচ্ছে। তাতে উপকার হয়েছে কিনা বোঝা যায়নি কিছু। বুধি সারাদিন গোয়ালে বসে ঝিমোয়। খাওয়াও অনেক কমে গেছে। তবে রজবকে দেখলে বুধি যে এখনও খুব খুশি হয় তা রজব বুঝতে পারে। রজব বুধির গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। এই আদরটুকু বুধি এখনও চোখ বুজে বেশ উপভোগ করে।

দুপুরে খেতে বসে রজবের স্ত্রী বলে, "দেখ তাহের যখন বলছে তখন বুধিকে এবার বেচেই দাও।"

রজবের মন গতকাল রাত থেকে ভাল নেই। তাই হঠাৎ তার রাগ হয়ে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে, "তাহের বলছে বলেই আমি বুধিকে বেচতে পারব না।"

"দেখ, মাথা গরম করো না। তাহের এখন বড় হয়েছে।

বড় চাকরি করে। জানে বোঝে আমাদের থেকে অনেক বেশি। বুধির জন্য এই বয়সে ছেলের সঙ্গে অশান্তি করো না। ওর ঘাড়ে সাবেরার বিয়ের দেনা আছে। বাচ্চারা পড়াশুনা করছে। খরচা কত। আমাদেরও তো উচিৎ ওকে সাহায্য করার জন্য খরচা কমানো। আর দেখ, যদি বুধি তোমার সামনে মারা যায় তাহলেও তোমার কষ্ট হবে। আমি জানি বুধি তোমার কাছে কি। আমি বুধিকে তোমার থেকে কম ভালবাসি না। কিন্তু কি করবে বল? তাহেরের যখন পছন্দ নয়... তাই বলছিলাম ওকে বেচেই দাও পরশুর হাটে। শেষের দিকে গলাটা ভারি হয়ে আসে রজবের স্ত্রীর।"

(৪)

রজব খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ে। সে দিনটা আর পরের দিনটা বড়ই অস্বস্তিতে কাটে রজবের। এই বুড়ি মৃত্যুপথযাত্রী পশুকে কিনবে কে? একমাত্র কসাইরা ছাড়া।

ছোট মেয়ে সাবেরার বিয়ের পর থেকেই রজবের নগদ টাকার টানাটানি চলছে, এবারের ফসল উঠতেও দেরি আছে। ফসল উঠলেও বা কি? সারা বছরের খোরাকি রেখে কতটা উদ্বৃত্ত থাকবে বেচবার জন্য, তা এখন থেকে আন্দাজ করা সম্ভব নয়। যদি বৃষ্টি কম বেশি হয় তাহলে ফসল নষ্টও হয়ে যেতে পারে। বর্তমানে রজব ছেলে তাহেরের উপরই নগদ টাকার জন্য নির্ভরশীল। যদি হাতে নিজের কিছু নগদ টাকা থাকত, তাহলে হয়ত আর বুধিকে বেচবার কথা বলত না কেউ।

সারা রাত ঘুম হয় না রজবের। অনেক চিন্তা ভাবনা করে অবশেষে ঠিক করে যে বুধিকে বেচেই দেবে। বাড়ির কেউই বুধিকে চায় না। নিজেরও বর্তমানে আর্থিক সামর্থ্য নেই। চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় বুধি মারা যাবে তা রজব সহ্য করতে পারবেনা। তার থেকে যা হবার চোখের আড়ালেই হোক।

সকাল সকাল উঠে নমাজ পড়ে রজব। বুধিকেও তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়ে দেয়। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বুধির দড়িটা ধরে বেরিয়ে পড়ে।

পাশের গ্রামে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় শনিবার গোরু মোষের বিরাট হাট বসে। আশপাশের গ্রামের অনেক লোকই গোরু, মোষ, বলদ, ছাগল কেনাবেচা করতে সেই হাটে আসে। আজ সেই হাটেই বুধিকে বেচে দেবে ঠিক করেছে রজব।

প্রায় তিন মাইল দূরে হাট। বুধি ধীরে ধীরে রজবের পিছনে পিছনে হাঁটে। গলার ঘণ্টায় টুং টাং শব্দ হয়। রজব ভারী মন নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলতে থাকে হাটের দিকে।

গ্রামের বাইরে বড় রাস্তা। বড় রাস্তার উপর বাস স্টপ। সেখান থেকে একটু আগে গিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে রাস্তা সোজা চলে গেছে হাটের দিকে। মাইল দুয়েক বাস স্টপ থেকে। বাস স্টপের কাছে দুটো চায়ের দোকান, দুটো মিষ্টির দোকান। পান সিগারেটের স্টলও আছে। অত ভোরেও চায়ের দোকানের সামনের বেঞ্চে কয়েকজন বসে আছে। দোকানের উনুনে আগুন পড়ে গেছে।

চায়ের দোকানের একটা বেঞ্চে বসে ছিল নীলু হাজরা। নীলুর সঙ্গে চোখাচুখি হতেই নীলু উঠে রজবের কাছে আসে। মুচকি হেসে বলে "সেলাম চাচা। কোথায় যাওয়া হচ্ছে সকাল সকাল?"

এই নীলু হাজরা লোকটা রজবের গ্রামের লোক। কিন্তু ওকে দু'চোখে দেখতে পারেনা রজব। লম্বা রোগা চেহারা, পাট পাট করে চুল আঁচড়ানো, মুখে ধূর্ততার ছাপ। আগে রাজমিস্ত্রির কাজ করত। কিন্তু কয়েক বছর হল সেসব ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক কি যে করে এখন নীলু হাজরা তাও রজব জানে না। বড় বড় লোকের সাথে ওঠা বসা চলে। গ্রামের মোড়ল, পঞ্চায়েত প্রধান, গ্রামসেবক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, এমনকি স্বয়ং এম.এল.এ. সাহেবের সঙ্গেও নীলুর এখন ওঠা বসা চলে। নীলু এখন গ্রামের একজন টাকাওয়ালা লোক। বয়স ত্রিশ বত্রিশ হবে।

মাস আষ্টেক আগে হঠাৎই একদিন নীলু হাজরা রজবের বাড়ি এসেছিল। অনেক ভনিতার পর বলেছিল যে সরকার থেকে নাকি কি এক ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আই.আর.ভি.পি.) শুরু করেছে। এর ফলে গ্রামের গরীব লোকেরা নিজের কাজকর্ম শুরু করে পয়সা কামানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে অনেক কম সুদে টাকা ধার পাবে। রজবের যদি কোনো কিছুর জন্য টাকার দরকার থাকে তাহলে নীলু তা পাইয়ে দিতে পারে।

রজব বুঝতে পেরেছিল যে নীলুর মাধ্যমে যে টাকা আসবে তা নির্ঘাত অসততার টাকা। তাই সে নীলুকে সাফ বলে দিয়েছিল যে তার সরকারি টাকার দরকার নেই। তাই শুনে নীলু নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বলেছিল, "সেকি

চাচা! সরকার খয়রাৎ করছে টাকা, আর তুমি নেবে না? কিরকম অদ্ভুত লোক তুমি?”

রজব বলেছিল, “খয়রাৎ আবার কিরে? এতো ধারের টাকা। সরকারকে তো আবার টাকা শোধ দিতে হবে।”

“আরে চাচা তুমিও যেমন! সরকারি ধার মানেই তো খয়রাৎ। কে আর ও টাকা ফেরত দেয়? আর পরের বছরেই তো ভোট। ভোটের সময় ধার মকুব না করলে এই সরকারকে হেরে ভূত হয়ে যেতে হবে। তুমি চাইলে এখনি কয়েক হাজার টাকা পেতে পার। তার সব ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোমাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না।”

এই সব চালাকির কথা শুনে সিধে সাধা রজব চটে উঠেছিল। “না না, দরকার নেই আমার ওরকম হারামের টাকায়। সারাজীবন সৎ পথে থেকে এসেছি। এখন এই বয়সে হারামের টাকা নিয়ে আল্লাকে নারাজ করতে পারব না। ওরকম কথা শুনলেও গুনাহ হয়। যা, যা, বেরো তুই। খবরদার, আর কখনও আমাকে টাকার লোভ দেখাতে আসবিনা।”

নীলু হাজরা অনেক বুঝিয়েও রজবকে সরকারি টাকা নেবার জন্য রাজি করাতে পারেনি। আর রজবও বুঝে গেছিল যে নীলু হাজরা লোকটা সুবিধার নয়। তাই ওকে এড়িয়ে চলত রজব।

(৫)

সকাল সকাল চায়ের দোকানের সামনে নীলুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হতে পারল না রজব। নীলুর প্রশ্নের উত্তরে গোমড়া মুখে বলল, “এই যাব একটু হাটের দিকে। সে কি চাচা! তুমি বুধিকে হাটে নিয়ে যাচ্ছ বেচবে বলে? ওকে কিনবে কে কসাইরা ছাড়া? সারা গ্রাম জানে তুমি বুধিকে কত ভালোবাস। সেই তুমিই কিনা বেচারিকে বেচবে বলে নিয়ে যাচ্ছ? হঠাৎ তোমার এই মতিচ্ছন্ন হল কেন চাচা?”

দুঃখের সময় স্বয়ং শয়তানের কাছ থেকে সহানুভূতি পেলেও মানুষ গলে যায়। তাই রজবও মনের দুঃখে বলে ফেলে, “তো কি করব বল? তাহের আর তোর চাচি কেউ ওকে আর বসিয়ে খাওয়াতে রাজি নয়। আর আমার হাতেও নগদ পয়সা কড়ি তেমন নেই এখন যে ওকে বসিয়ে খাওয়াবো। বেচে দেওয়া ছাড়া আর গতি কি বল?”

“আরে চাচা তো আগে বলতে হয়। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তুমি বুধিকে বেচে দেবে। দেখো চাচা তুমি যদি আমার কথা শোন, তবে আর তোমার বুধিকে হাটে নিয়ে যাবার দরকার হবে না। বরং তোমার হাতেই কিছু টাকা আসবে যা তুমি বুধির জন্য খরচ করতে পারবে। এই বলে রজবের হাত ধরে টানতে টানতে নীলু চায়ের দোকানে নিয়ে যায়। তারপর চেঁচিয়ে বলে... এই ইস্পিশাল চা দুটো পাঠিয়ে দে তাড়াতাড়ি, চারটে ভাল বিস্কুটও দিবি।

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে রজব বলে... হ্যাঁরে নীলু, তোর কথা কিন্তু আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

কিছু বোঝবার দরকার নেই চাচা, আমি যা বলছি তাই করো, তাহলেই বেশ কিছু টাকা হেঁটে এসে তোমার ঘরে ঢুকবে, তুমি আর না করো না।

রজব দ্বিধায় পড়ে, দোনোমনা করে। একবার ভাবে না করে দেয়, পরমুহূর্তেই পাশে দাঁড়ানো বুধির ওপর নজর পড়ে। বেচারি রজবের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন বলতে চাইছে, এত সকাল বেলায় আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! আহা, ও বেচারি তো জানেও না যে রজব ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল।

রজবের মনটা হাহাকার করে ওঠে। বুড়ি হয়ে গেছে আর দুধ দিতে পারে না বলেই কি বুধির বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই? বহুদিন যে সেবা করেছে তার কি? তার কোনও দামই নেই? এসব কথা মনে হলেই রজব ভাবে, আচ্ছা একবার নীলুর কথা শুনেই দেখা যাক না, যদি কোনও পথ বেরিয়ে আসে!

আস্তে আস্তে নিচু গলায় রজব বলে... হ্যাঁরে নীলু এরকম কোনও ব্যাবস্থা কি হতে পারে সত্যি? কিন্তু, দেখ ওইসব সরকারি ব্যাপার স্যাপার আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না, তুই ঠাট্টা করছিস না তো?

নীলু এসব শুনে নাটকীয় ভাবে রজবের পা ছুঁয়ে বলে... চাচা, আমি তোমার তাহেরের মত, তুমি আমার বাপের মত। তোমার সাথে কি ঠাট্টা করতে পারি? তোমায় কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না। এখন সোজা বাড়ি ফিরে যাও, কাল সকালেই আসব তোমার কাছে। সব কাজ হয়ে গেলে তুমি একটু দেখো আমায়...হেঁ হেঁ হেঁ!!

হ্যাঁরে নীলু, ওটা হারেমের পয়সা নয়তো, তাহলে কিন্তু আমি নেব না।

আরে চাচা, এ বেইমানির পয়সা নয়, এ হল বুদ্ধির পয়সা। বুদ্ধি খরচ করে পাইয়ে দেব, সরকারি টাকা নিতে

কোনও দোষ নেই। চাচা, ভেবে দেখো সরকারকে তো টাকা খরচ করতেই হবে, তুমি না নিলে হয়তো অন্য কেউ নেবে। তবে তুমিই বা নেবে না কেন? যাও, এখন সোজা বাড়ি চলে যাও, কাল সকালে আমি আসছি।

(৬)

নানা কথা ভাবতে ভাবতে রজব বাড়ি ফিরে আসে। রজবের স্ত্রী তো বুধিকে নিয়ে রজবকে ফিরে আসতে দেখে অবাক। রজব সব কথা বুঝিয়ে বলে, সব শুনে রজবের স্ত্রী বলে, নীলু কি কিছু করতে পারবে বলে মনে হয়?

দেখাই যাক না, নয়তো পরের মাসের হাটে বুধিকে বেচে দেব।

সারারাত ভাল করে ঘুম হয় না রজবের, স্বপ্ন দেখে যে কয়েকজন লোক বুধিকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে আর বুধি অসহায় ভাবে রজবের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে।

সকাল সকাল নীলু চলে আসে। চলো চাচা বেরিয়ে পড়ি, অনেক জায়গাতে যেতে হবে আর সঙ্গে হাজার দেড়েক টাকাও নাও।

বলছিস কি তুই? এত টাকা আমি পাব কোথায়?

দেখো চাচা, শুরুতে তো কিছু খরচপত্র করতে হবে নাকি? না থাকে তো চলো ধার পাইয়ে দিচ্ছি, টাকা পেলে সুদ সমেত ফেরত পাইয়ে দিচ্ছি।

টাকা ধারের কথা শুনে রজব একবার ভাবে নীলুকে না করে দেয়, পরমুহূর্তেই রাতের স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ে যায়।

না, যা হবার হোক বুধিকে কিছুতেই বেচতে পারব না! মনে মনে আওড়ায় রজব।

গ্রামের নিত্যানন্দ দাস টাকা ধার দেয়, তার কাছে রজবকে নিয়ে যায় নীলু।

নীলুর মধ্যস্ততায় বিনা কিছু বন্ধক রেখেই টাকা ধার দিতে রাজি হয় নিত্যানন্দ।

আধঘণ্টার মধ্যে কাগজে টিপছাপ দিয়ে কড়কড়ে তিরিশটা পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে নিত্যানন্দের গদি থেকে বেরিয়ে আসে নীলু।

বাইরে বেরিয়ে এসে নীলু বলে, দেখো চাচা, আমি যেখানে যেমন বলব সেখানে তেমন দিয়ে যাবে। যদি বলি একটা নোট, তাহলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দেবে, দুটো বললে দুটো আর কোনও প্রশ্ন করবে না। এখন চলো তোমায় গ্রামসেবকের কাছে নিয়ে যাই।

গ্রামসেবকের কাছে নিয়ে গিয়ে নীলু বলে... ইনি আমার চাচা রজব আলি সাহেব, আপনাকে এনার প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি দিতে হবে।

গ্রামসেবক হাসতে হাসতে বললেন... আরে নীলু ভাই ওনাকে তো তুমি আগেও অনেকবার টাকা নেবার কথা বলেছ, উনি তো কানেই তুলতেন না।

তখন চাচার মনে অনেকরকম ভুল ধারণা ছিল, এখন উনি রাজি হয়েছেন। ওনাকে একটা গোরু পাইয়ে দিন, উনি এবার থেকে দুধের ব্যবসা করতে চান।

তোমাকে কখনও না করেছি নীলুভাই, উনি যখন তোমার চাচা, তখন তো আমারও চাচা।

তাহলে ওনার কেসটা যত তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেন, তাহলে চাচার উপকার হয়!!

"নীলু ভাই, কেস তো আমি একদিনেই বানিয়ে দিতে পারি, তবে হাট তো আবার বসবে সামনের মাসে। তাই গোরু পেতে একমাস সময় তো লাগবে। তুমি তিন-চার দিন পর ওনাকে নিয়ে এস। আমি এর মধ্যে সব কাগজপত্র তৈরি করে রাখব। চাচা আপনি ভাববেন না। গোরু আপনি পাবেনই পাবেন। আরে সরকার তো আই.আর.ডি.পি. স্কিম চালুই করেছে সবাইকে কিছু না কিছু পাইয়ে দেবার জন্য। এই স্কিম শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সালে আর এখন ১৯৮১ সাল। এই তিন বছরে কত লোক কত কিছু পেয়ে গেল। এবার আপনিও পাবেন। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজিও চান যে গ্রামের লোকেরা স্বাবলম্বী হোক। কি বল নীলু ভাই।"

"ঠিক কথা। আর হ্যাঁ, কেসটা এমনভাবে বানাবেন যেন চাচা সব থেকে বেশি টাকা পেতে পারেন।"

"সব থেকে বেশি ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে, যেটা হবে গোরুর দামের অর্ধেক। অর্থাৎ ছ'হাজার টাকা পেতে গেলে গোরুর দাম হতে হবে বারো হাজার টাকা ও বাকি ছ'হাজার নিজের পকেট থেকে দিতে হবে। আর অনুসূচিত জাতি বা জনজাতির ঠেকে হতে হবে বা বিকলাঙ্গ হতে হবে। চাচাকে কি দেখাব বল?"

"বিকলাঙ্গ দেখিয়ে দিন। ওই সার্টিফিকেট আমি বার করে নেব। আমরা তাহলে চারদিন পরেই আসব। চাচা, দু'টো নোট ওনাকে দিন।"

বাইরে বেরিয়ে নীলু বলে, "চাচা কাল থেকে যখন আমার সঙ্গে বেরোবে তখন একটা লাঠি হাতে নিয়ে বেরোবে। আর যেখানেই নিয়ে যাই না কেন সেখানে গিয়ে খোঁড়াতে থাকবে। বাকি সব চিন্তা আমার।"

(৭)

তারপর কয়েকদিন ধরে চলে প্রচন্ড ব্যস্ততা। নীলু হাজরা রজবকে দেখা করাতে নিয়ে যায়। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। ক্রয় সমিতির সদস্য, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ইত্যাদি সবার সঙ্গে শহরের সরকারি হাসপাতাল থেকে বিকলাঙ্গতার প্রমাণপত্রও তৈরি হয়ে যায়। সব জায়গায় দুটো তিনটে করে নোট হাত বদল হয়। রজব লক্ষ্য করে যে এদের সবার সাথে নীলুর খুব খাতির। সবশেষে নীলু রজবকে নিয়ে যায় সরকারি ভেটেরনারি ডাক্তারের কাছে।

"ডাক্তারবাবু, ইনি আমার চাচা রজব আলি সাহেব। আই.আর.ডি.পি. স্কিমে ইনি একটা গোরু কেনার জন্য লোন পাচ্ছেন। সরকারি মঞ্জুরি শিগগির এসে যাবে। সামনের হাটে গোরু কেনা হবে। আর ইয়ে ডাক্তারবাবু, কি বলে গিয়ে, আপনাকে একটা বুড়ি গোরু পাস করতে হবে।"

চোখ ছোট ছোট করে মুচকি হেসে ডাক্তারবাবু বলেন, "সে তো করে দেওয়া যায়। তবে আবার ফেঁসে টেসে যাব না তো?"

"হেঁ...হেঁ...হেঁ... কি যে বলেন স্যার। ফাঁসুক আপনার শত্তুর, আমি আছি কি করতে? চাচা, দুটো নোট ডাক্তারবাবুকে... হ্যাঁ তো ডাক্তারবাবু, আমার এই চাচাকে উদ্ধার করতেই হবে। হাটের দিন দয়া করে পৌঁছে যাবেন।"

ডাক্তারবাবু নোটদুটো পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলেন, "আরে নীলু ভাই কিচ্ছু চিন্তা করো না। আমি ঠিক সময়ে পৌঁছে যাব। এর আগেও তো কতবার তোমার কাজ করে দিয়েছি। এবারও হয়ে যাবে।"

কিছুদিনের মধ্যেই দুধের ব্যবসা করবার জন্য, রজবকে সরকারি টাকায় গোরু কিনে দেবার মঞ্জুরিও এসে পড়ে। নীলু রজবকে সেই সুখবর জানিয়ে আসে।

(৮)

হাটের আগেরদিন শুক্রবারের সন্ধ্যায় একটা লোককে নিয়ে রজবের বাড়ি হাজির হয় নীলু।

"চাচা, তোমার বুধিকে একদিনের জন্য ছেড়ে দিতে হবে এই কানাইয়ের হাতে। আজ এ বুধিকে নিয়ে যাবে। রাত্রে বুধি এর কাছেই থাকবে। সকালে হাটে গিয়ে বুধিকে ফের আমরা ব্যাঙ্কের পয়সায় কিনে নেব। কানাইকে একটা নোট দিয়ে দাও।"

একটা নোট নিয়ে আর বুধিকে নিয়ে কানাই চলে যায়। হতভম্ব রজবকে নীলু বোঝায়, "কাল সকালে আমি এসে তোমাকে হাটে নিয়ে যাব। ওখানে তুমি কানাইয়ের সাথে বুধিকে দেখতে পাবে। তুমি খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবার পর, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাহেব ও ক্রয় সমিতির সদস্য যারা থাকবেন, তাদের সবার সামনে বুধিকে দেখিয়ে বলবে যে, তোমার ওই গোরুটাই পছন্দ। তুমি ওকেই কিনবে। তবে ভুল করেও যেন হাটে বলে ফেলনা যে বুধি তোমারই গোরু, তাহলে সব গড়বড় হয়ে যেতে পারে। সব শালাকে অবশ্য সেট করে রেখেছি। তবুও সাবধানের মার নেই।"

বিমূঢ় রজব বলে ওঠে, "হাটে আমার বুধিকেই আবার কিনতে হবে! বলিস কি তুই নীলু?"

নীলু এবার খ্যাঁক খ্যাঁকিয়ে হেসে ওঠে, "আরে চাচা, আই. আর. ডি. পি. তে গোরু কেনার ওই তো মজা।"

ভোর হতে না হতেই নীলু এসে পড়ে। চান টান করে, নমাজ পড়ে, রজব তৈরি হয়েই ছিল।

হাটে পৌঁছে নীলুর শিক্ষা মতন এদিক ওদিক ঘুরেও দু'চার জনের সাথে লোক দেখান দর দাম করে, দু'চারটে গোরু মোষ দেখে, বুধির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় রজব।

নীলু ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে নিয়ে এগিয়ে আসে, "কি চাচা গোরু পছন্দ হল?"

রজব ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে বলে, "সাহেব, এই গোরুটাই আমার পছন্দ। একেই কিনব আমি।"

ম্যানেজার ভীষণ অবাক হয়ে বলেন, "আরে রজব বল কি? এতো একদম বুড়ি গোরু। একে দেখে তো মনে হচ্ছে শিগগির মারা যাবে। একে কিনলে তোমার দুধের ব্যবসার কি হবে? ব্যাঙ্কের ধার শোধই বা করবে কি করে?"

তোতা পাখির মত রজব বলে, "হুজুর, আমরা গ্রামের চাষা ভূষো লোক। লেখা পড়া জানিনা। তবে এসব গোরু মোষের ব্যাপার ভাল বুঝি। আমি এই গোরুটাই কিনব।"

ততক্ষণে সরকারি ভেটেরনারি ডাক্তারও এসে হাজির। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ডাক্তারের মত চান। ডাক্তার বুধির পেট টিপে আর মাথায় হাত বুলিয়ে, সুস্থ হবার প্রমাণপত্র দিয়ে দেন দু'মিনিটের মধ্যে।

"চাচাকে গোরুটা কিনে দিন। আপনার কোনও চিন্তা নেই স্যার। আপনার ব্যাঙ্কের টাকা মারা যাবে না। এতো বীমা করানো থাকবে। ভাল-মন্দ কিছু হয়ে গেলে বীমার টাকাতেই আপনার ধার শোধ হয়ে যাবে। হেঁ..হেঁ.. চাচা, আরও দুটো নোট স্যারকে...।"

(৯)

কিছুক্ষণের মধ্যে লোকদেখানো দরদাম করে বারো হাজার টাকায় বুধিকে কিনে নেওয়া হয়। কানাই বারো হাজার টাকার নীচে নামতে রাজি হয় না। গোরুর দামের অর্ধেক ছ'হাজার টাকা নীলু বার করে দেয়। আর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার দেন ছ'হাজার টাকা। এই ছ'হাজার টাকাই হল সব থেকে বেশি টাকা যা একজন বিকলাঙ্গ, আইন মোতাবেক আই.আর.ডি.পি. স্কিমে পেতে পারত।

কানাই-এর থেকে রসিদ নেওয়া, গোরুর কানে ঠিকানা লেখা চিট লাগানো, নম্বর লাগানো, স্ট্যাম্প লাগানো এসবও নীলু হাজরার তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ে যায়।

হাটে উপস্থিত ক্রয় সমিতির সদস্যরাও পুরো ব্যাপারটা দেখেও দেখেন না। নীলুর এনে দেওয়া চা-সিঙ্গাড়া খেতে ব্যস্ত থাকেন ও নিজেদের মধ্যে খোশ গল্প করতে থাকেন।

নীলু হাজরা বুধির দড়ি যত্ন করে রজতের হাতে ধরিয়ে ফিস ফিস করে বলে, "চাচা তুমি এবার বাড়ি যাও। আমি একটু বেশি রাতে আসব তোমার কাছে। কানাই-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসব। আজই তোমার সব পাওনা গন্ডা চুকিয়ে দেব। হেঁ..হেঁ.. নীলুর কাছে বেইমানি পাবে না। তুমি কিন্তু জেগে থেকো।"

একটু বেশি রাতেই নীলু টলতে টলতে আসে। মুখ থেকে ভুর ভুর করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। বলে, "একটু দেরি করেই এলাম চাচা।" এই বলে, দুটো কাগজ আর একটা টাকার বান্ডিল রজবের হাতে দেয় নীলু।

"হিসাব বুঝে নাও চাচা। কানাইকে যে বারো হাজার টাকা গোরু কেনার জন্য তখন দেওয়া হল, তার থেকে নিজের ছ'হাজার টাকা আমি নিয়ে নিয়েছি। নিত্যানন্দের ধার সুদ সমেত শোধ করে দিয়েছি। কানাইকে দিতে হয়েছে একশ টাকা। কিছু টাকা গেছে বীমা করাতে ও সবাইকে চা-মিষ্টি খাওয়াতে। তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কাজ বলে আমি মাত্র এক হাজার টাকা নিয়েছি আমার মেহনতের দাম। এই বান্ডিলে পুরো তিন হাজার টাকা আছে। আর হ্যাঁ, এই কাগজ দুটো সাবধানে রেখে দাও। একটা হল ধার শোধের রসিদ ও অন্যটা হল বীমার কাগজ। কি এবার খুশি তো? দেখলে তো নীলু চাইলে কি করতে পারে! তুমি তো আমাকে পাত্তাই দিতে না। এখন মানবে তো যে আমি কত কাজের মানুষ?"

রজব মনে মনে হিসাব করে, এর আগে যে তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, তার একশ টাকা বেঁচে আছে। তাহলে সব সুদ্ধ হল তিন হাজার একশ। এই টাকায় তার প্রিয় বুধির জীবনের শেষ কটা দিনের চিকিৎসার খরচ এক রকম চলে যাবে। আর এর পর ফসল যদি ভাল হয় তো আরও ভাল। তখন কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে আসা যাবে। বলা যায় না, ভাল ডাক্তার দেখালে বুধি আরও বেশি কিছুদিন বেঁচেও যেতে পারে। একসময় বুধি রজবের পরিবারের কত সেবা করেছে। এখন তো রজবেরও কর্তব্য বুধির যথাসাধ্য সেবা করা।

এসব ভাবতে ভাবতে রজবের মনটা নীলুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। "সত্যি নীলু, বুদ্ধিমান ছেলে বটে তুই। কি করে যে এতসব করলি তা বুঝতেই পারলাম না। আল্লা, তোকে দোয়া করবেন।"

নীলু আবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে ওঠে। মুখ থেকে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরোয়।

"তোমাদের পাঁচজনের আশীর্বাদেই তো করে খাচ্ছি চাচা। তা চাচা এবার তো গোরু খুব কিনলে। পরের মাসে পোলট্রি করার জন্য মুর্গী কেনার দরখাস্ত দিয়ে যাও। আর তার পরের মাসে ...হুঁ, একটু ভাবতে হবে যে কি করা যায়, তবে তোমার সব দরখাস্ত পাস হয়ে যাবে। সরকার তো গ্রামের উন্নতির জন্য টাকা দিতে সবসময় রাজি। তা তোমরা যদি সে টাকা না নাও তবে গ্রামের উন্নতি হবে কেমন করে? আর আমারই বা চলবে কেমন করে? তবে হ্যাঁ, এরপর থেকে যা হবে তার অর্ধেক বখরা কিন্তু আমার।

আর শোন, তোমার বুধি তো আর কয়েক মাসের মধ্যেই পটল তুলবে। তখন ওর নম্বরওয়ালা কানটাকে আমার কাছে নিয়ে এস। বীমা কোম্পানির লোকের সাথে আমার কথা হয়েছে। তোমার বুধিকে বেশি দাম দেখিয়ে বীমা করানো হয়েছে। বীমা কোম্পানির কাছ থেকে যা টাকা পাবে, তা দিয়ে ব্যাঙ্কের ধার শোধ করেও বেশ কিছু টাকা বাঁচবে। আমার কথা শুনে চলবে তো কয়েক বছরের মধ্যেই লালে লাল হয়ে যাবে। আমার কথাকে ঠাট্টা মনে করোনা। তুমি শুধু এই নীলুর লীলা খেলা দেখতে থাক।"

এই বলে টলতে টলতে বেরিয়ে যায় নীলু। আর হতভম্ব রজব দোয়া করে নীলুর জন্য।

তবে একটা কথা রজব আলি জানতে পারে না, যে কোনমতেই রজবকে লাইনে আনতে না পেরে, নীলু হাজরাই বুধির চিকিৎসার খবর তাহেরের কানে তুলে দিয়েছিল।♦♦♦

গ্রেট ফেলুদা

দীপিকা দত্ত চৌধুরী

ফেলুদা মানেই ঝকঝকে স্মার্ট
শিখে নিতে অসুবিধে নেই মার্শাল আর্ট
তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে
কথার যুক্তিতে
প্রবল ব্যাক্তিত্ব
স্বচ্ছন্দ নির্ভীক
প্রখর দৃষ্টিতে চারিদিক
ফেলুদা মানেই জটিলতা কাটে সহজে
সব রহস্যের সমাধান
শান দেওয়া মগজে
তোমার গোয়েন্দা কাহিনীতে
আছে লালমোহন তোপসে সাথে
তবুও সবাইকে ছাপিয়ে
একাই একশো হয়ে কাঁপিয়ে
বলি ফেলুদাকে কুর্নিশ জানিয়ে
তুমি আমাদের বড়ই প্রিয়
আগেও ছিলে এখনো আছো
থাকো যুগ যুগ জিও।
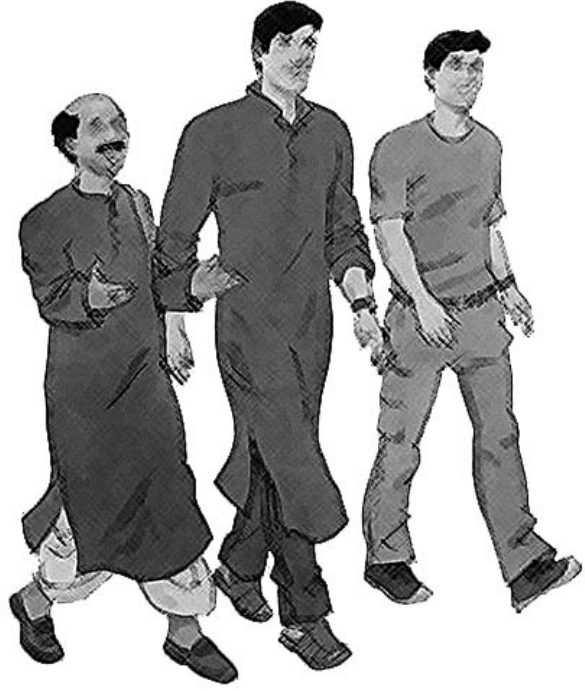
কৌতূহলী

শিবাদিত্য দাশশর্মা

আমি তাকে চিনি, তাকে আমি দেখেছি।
এই মৃত মহাদেশে হেঁটে যায় আলোআঁধারি
অথবা খেলায় সব ছড়ায় শুঁকনো পাতা
কখনো সুখের ছবি ছুঁড়ে ফেলে
কখনো অলস মহুয়া ডাকে
কোনো এক অচেনা গলির মোড়ে
সে আয়না দেখায় তোমার সুখের
আয়না দেখায় তোমার দুখের
কোনো এক অন্ধ চোখের জলে আবছা তোমার প্রতিচ্ছবি
ধুপের গন্ধে আটকা পরেছি, রাতের গন্ধে ঝড়ের স্মৃতি
শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পরে, শরতে সে আসবে
পাতা ঝরার বেলায় দেখবো তার কুয়াশা ঘেরা স্বপ্ন আমার জানলায়।
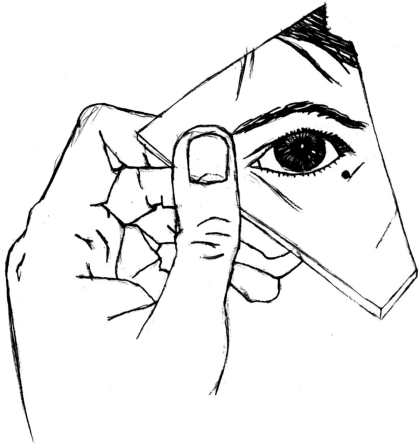
নীলিমায় নীল - চিত্রগ্রাহকঃ অর্ণব দাস মোহান্ত

টম এন্ড জেরি - চিত্রশিল্পীঃ দ্বীপান্বিতা ভট্টাচার্য

গল্প

ঋজু পাল

জীবন বড়ই বিচিত্র। কখন কোথায় কি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য সেটা যদি এক মুহূর্তের জন্যও আমরা জানতে পারতাম তা হলে হয়ত অনেক কিছুই পালটে ফেলতে পারতাম। তবে নিয়তিকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস আমাদের কারোরই নেই।

কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে কর্পোরেট দুনিয়াতে পা রাখলাম। নতুন বন্ধু, নতুন পরিবেশ, নতুন দায়িত্ব, বেশ ভালই কাটছিল দিনগুলো। তবুও কোথাও যেন একটা দম বন্ধ করা চাপ সবসময় লেগেই আছে, ছুটি একদম পাই না। বন্ধুদের সাথে আড্ডা, গল্প করা প্রায় ভুলেই গেছি বলতে গেলে, একমাত্র সম্বল

সোশ্যাল মিডিয়া। সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে বাস ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি অর্ণব ফোন করছে; অর্ণব আমার কলেজ জীবনের সবথেকে কাছের বন্ধু, এখন হায়দ্রাবাদে থাকে।

----হ্যালো বস ! কি খবর ?

----আরে অর্ণব! কেমন আছিস? আমার কেটে যাচ্ছে রে!

----সে তো দেখতেই পাচ্ছি ভাই, দিন দিন মোটা হচ্ছিস! বউ পালাবে এবার ...হা হা হা।

----আহা! চাপ নেই, পালাবে না, তারপর বল কলকাতা কবে আসছিস? অনেক দিন তোর শ্রীমুখ দর্শন করিনি।

----হা হা হা, শোন যে জন্য ফোন করলাম, অফিস থেকে ক'টা দিনের ছুটি নিয়ে নে, একটা ঘুরতে যাবার প্ল্যান হয়েছে।

বলিস কি রে? দারুণ ব্যাপার তো, কোথায় যাবি? দেবাঞ্জন, রাহুল এদের বলেছিস?

----ইয়েস বস। শোন প্ল্যান হল রাঁচি যাওয়া হবে, ওয়াটার ফলস, জঙ্গল, উফফ দারুন হবে ট্যুরটা !

----কি বললি? রাঁচি? না ভাই, সরি, আমি যেতে পারব না।

----ওসব বাহানা চলবে না, যেতে তোমায় হবেই চাঁদু ! হোটেল বুক, ট্রেনের টিকিট সব কাটা হয়ে গেছে, আর এখন তুমি যাবো না বললে তো চলবে না বস !

যে আনন্দটা এতক্ষণ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল হঠাৎ করে সেটা যেন ম্লান হয়ে গেল, রাঁচি? আবার রাঁচি?

----কি রে শুনতে পাচ্ছিস? বোবা হয়ে গেলি কেন? শোন সামনের শুক্রবার রাতের হাওড়া হাতিয়া এক্সপ্রেস ধরব। আমি দুপুরেই দমদম ল্যান্ড করে নেব। বাকিরাও চলে আসবে। শনিবার সকালে রাঁচিতে পা রাখব, দুদিন চুটিয়ে মস্তি, সোমবার রাতের ট্রেনে ব্যাক! বুঝলি তো?

----হুম, আচ্ছা, ঠিক আছে।

----চল টাটা , রাতে কথা হবে, ডোবাস না ভাই।

----না, কালই ছুটির দরখাস্ত করছি অফিসে , বাই।

ফোনটা একপ্রকার কেটেই দিলাম। ভীষণ মনটা ছটফট করছে, অতীত কি মানুষকে এভাবেই তাড়া করে। সেই স্কুলের সময়কার কথা, মনে করলেই বুকের মধ্যে একটা চিনচিনে ব্যাথা অনুভব করি ...নাহ, আর মনে করব না, আমি রাঁচি যাবই, এভাবে ভয় আঁকড়ে বসে থাকার কোনও মানে হয় না !

দেখতে দেখতে ক'টা দিন কেটে গেল, অফিসে ছুটি নেওয়া, ব্যাগ গোছানো, সব বন্ধুদের জন্য কিছু কেনা, হাজার হোক কতদিন পরে দেখা হবে।

এসে গেল যাবার দিন, অফিস থেকে সন্ধ্যের মধ্যে ব্যাক করে স্নান সেরে কিছু মুখে দিয়েই ফোন করলাম অর্ণবকে। অর্ণব জানাল ওরা আটটার মধ্যেই হাওড়া ঢুকে যাবে। ১৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দেবে।

আমি আর দেরি না করে রেডি হয়ে বেড়িয়ে পরলাম। এমনিতেই জ্যামে ট্যাক্সি আটকে পড়লে চাপ আছে।

হাওড়া পৌঁছে ওদের ফোন করতেই দেখি ওরা ইতিমধ্যে চলে এসেছে। এক ছুটে সবার সামনে দাঁড়ানো, উষ্ণ আলিঙ্গন, হাসি ঠাট্টা-র মধ্যে দিয়ে মনের অস্বস্তি ভাবটা কেটে গেল। দেবাঞ্জন আমাদের গ্রুপের অঘোষিত ক্যামেরাম্যান, সঙ্গে সঙ্গে ডি.এস.এল.আর. বার করে ছবি তুলতে শুরু করল। ট্রেনের ঘোষণা শুনতেই সবাই ব্যাগ পত্তর নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাতে দাঁড়ালাম।

ট্রেনে উঠে সবাই নিজের নিজের সিটে ব্যাগ পত্তর রেখে নির্ভেজাল আড্ডাতে মেতে উঠলাম, সারা রাত বলতে গেলে ঘুম হলই না।

সকাল ৮ টায় রাঁচিতে নামলাম। অটো করে হোটেলের পথে রওনা হলাম। রাঁচিতে পা দিতেই হঠাৎ করে মনের অস্বস্তি ভাবটা জেগে উঠল। রাঁচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে এই কয়েক বছরে, রাস্তা ঘাট খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

----কি রে ঋজু? তোর কি শরীর খারাপ? রাহুলের প্রশ্নে চমকে উঠলাম।

----কই? না তো, রাতে ঘুম হয়নি তো, তাই একটু ম্যাজম্যাজ করছে শরীরটা !

----ও গিয়ে একটু রেস্ট নে, নয়তো বিকেলে বেরোতে পারব না !

হোটেল বেঙ্গল লাইনে উঠলাম আমরা সবাই। ইচ্ছে করেই একটা চার বেডের রুম নিয়েছিলাম। একসাথে থাকা, আড্ডা মারার ভীষণ সুবিধা হবে। রুমে ঢুকে সবাই একে একে ফ্রেশ হয়ে প্রাতরাশ করলাম। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের সুন্দর ভাবে ট্যুর প্ল্যান বুঝিয়ে দিলেন। আমরা ঠিক

করলাম বিকেলে টেগোর হিল, রক গার্ডেন, সিধু কানু পার্ক, মছলি ঘর এসব দেখব। কাল গোটা দিনটা তোলা থাক ওয়াটার ফলস-এর জন্য।

যথারীতি দুপুরের ভোজন পর্ব সাঙ্গ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ঘুরতে। হোটেল থেকেই গাড়ি বুক করে নিয়েছিলাম দুদিনের জন্য। দারুণ আনন্দ করে, গান গাইতে গাইতে, এ ওর পেছনে লাগতে লাগতে ঘুরে নিলাম অনেক জায়গা। ফোটো তোলা তো প্রতি পদক্ষেপেই লেগে ছিল। ক্লান্ত হয়ে রাতে যখন হোটেলে ফিরে এলাম তখন সবার মোবাইল আর ক্যামেরার ব্যাটারির সাথে বডিও রেড সিগন্যাল জানিয়ে দিয়েছে। ডিনার করেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলাম সবাই।

পরের দিন সকাল হতেই রেডি হবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। ৮ টায় গাড়ি এসে যাবে। কোনোমতে রেডি হয়েই বেরিয়ে পরলাম। প্রাতরাশ রাস্তায় কোথাও করে নেওয়া হবে। সকাল থেকেই আমার মনে সেই অস্বস্তির কালো ছায়া নেমে এসেছে, আজ এমন একটা জায়গার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছি, যেখানে পড়ে রয়েছে আমার অতীত।

আমরা যাচ্ছি হুডরু জলপ্রপাতের রাস্তায়। তারপর দেখব সীতা আর জোনহা। দেবাঞ্জনের কথায় চমক কাটল, দাদা সামনের দোকানটায় দাঁড়ান, বড্ড পেট টেনে ধরেছে। খাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাও ওদের জন্য পুরি সবজি খেতে হল, যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিলাম।

হুডরুতে পা রাখলাম তখন ঘড়িতে সকাল এগারোটা। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, তার ওপর চারপাশের জঙ্গল, গোটা পরিবেশ তাই কেমন অন্ধকারময়। সামনে দেখলাম সরকারি নির্দেশিকা, ৫০০টা সিঁড়ি নীচে নামতে হবে জলপ্রপাত দেখতে। রাহুল তো পারলে গাড়ি থেকে নামবেই না, কোনোমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে নিয়েই সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম। চেষ্টা করছিলাম একসাথে হাঁটার, কিন্তু কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম আমি বোধহয় অনেকটা এগিয়ে এসেছি। এতটা সিঁড়ি ভাঙলাম অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? অর্ণবরাই বা কোথায়?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম ওদের জন্য, যাহ্‌ কত আস্তে আস্তে নামছে ওরা! থাক, আমি একাই এগিয়ে যাই, হঠাৎ কি যে ঘোর লাগল আমি দ্রুততার সঙ্গে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁটার পর কানে এল জলের আওয়াজ, একটা সোঁদা মাটির গন্ধ চারপাশে ছেয়ে আছে। লক্ষ্য করে দেখলাম আমি আর আমার নিজের মধ্যে নেই,আমার শরীর আমার বশে নেই। কিসের আনন্দ, কিসের আগ্রহ আমাকে গ্রাস করছে একটু একটু করে, কেমন যেন একটা ভাল লাগার অনুভূতি মনকে শান্ত করে দিয়েছে।

সামনে জলপ্রপাতের গর্জন, নিচে বড় বড় পাথর, কোন আদিম যুগ থেকে পড়ে আছে কে তার হিসেব রেখেছে। জলস্রোতের টানে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়েছে। চারপাশে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কোনও জনপ্রাণী নেই।

খেয়াল করলাম আমি একটু একটু করে নীচে নামতে শুরু করেছি, অনায়াসে বড় বড় টিলা টপকে জলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। কিসের অমোঘ আকর্ষণে করছি জানি না।

কে যেন বলে উঠল, আয় ঋজু, চলে আয়, কত বছর পর এলি, সেই ক্লাস সেভেন ...মনে পড়ে? মনে পড়ে আমার আর্তনাদ, তোর সাহায্যর জন্য চিৎকার করা? মনে পড়ে তোর প্রিয় বন্ধুর কথা?

কান্না ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, তমাল তুই কোথায়? আমি এসেছি দেখ ভাই, আমি এসেছি!

আমি এখানে ঋজু, নিচে নেমে আয়, আয়, আর একটু, আমি জানি তুই কষ্টে আছিস, চলে আয়....

ঋজু? আর ইউ ম্যাড? হঠাৎ পেছন থেকে অর্ণবের ধাক্কাতে চমকে উঠলাম !

----কি হয়েছে? পেছনে দেখি রাহুল, দেবাঞ্জন অবাক হয়ে দেখছে, সঙ্গে আরও দু'জন।

----কি হয়েছে? তোমায় ধরে পেটানো উচিত? আত্মহত্যা করার এতই শখ তোমার যখন কলকাতাতেই করতে পারতে!!! দেবাঞ্জন রীতিমত অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছে।

সঙ্গের দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বলে উঠল, ভাইয়া, আপ দেখ নেহি সকতে ক্যা? বরসাতকে টাইম পর ইধার আনা মানা হ্যায়। নীচে কাহে আয়ে?

অর্ণব বলল ...ঋজু তোর হয়েছে টা কি বল তো? রাঁচি আসা ইস্তক তোকে ভীষণ চিন্তিত দেখছি!

----কিছু না, চল, এমনি ইচ্ছে হল তাই, তোরাও আস্তে আস্তে আসছিলিস দেখে একাই ...আচ্ছা বাবা, কান ধরছি। বাস্তবে যেন ফিরলাম। রাহুল বলল, চল বাবা গাড়িতে, তোর জন্য আমাকেও নামতে হল এত সিঁড়ি।

বললাম না কিছুই ওদের, বললাম না স্কুলে পড়াকালীন এখানেই হারিয়ে ফেলি আমার এক কাছের মানুষকে, যাকে ওরা কেউ চেনেই না। কি লাভ, কেউ কি বিশ্বাস করবে, আজ এত বছর পরে সেই বন্ধুকে কাছে পাবার আকুতি কতটা তীব্র হতে পারে। বর্তমান সময়ে যেখানে বন্ধুত্ব রাখাটাই কষ্টকর হয়ে ওঠে অনেকের কাছে!!!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চোখে পড়ল একটা বুনো গাছে কিছু রঙিন ফুল ফুটেছে। একটা ফুল তুলে ছুঁড়ে দিলাম পেছনে, মনে মনে বললাম......

তমাল, ভাল থাকিস ভাই, আমি তোকে ভুলিনি, কোনোদিন ভুলব না, তুই যে আমায় ভুলিসনি সেটা দেখে খুব ভাল লাগল রে। তোর আত্মার শান্তি কামনা করি।

বিদায় বন্ধু !!!! ♦♦♦
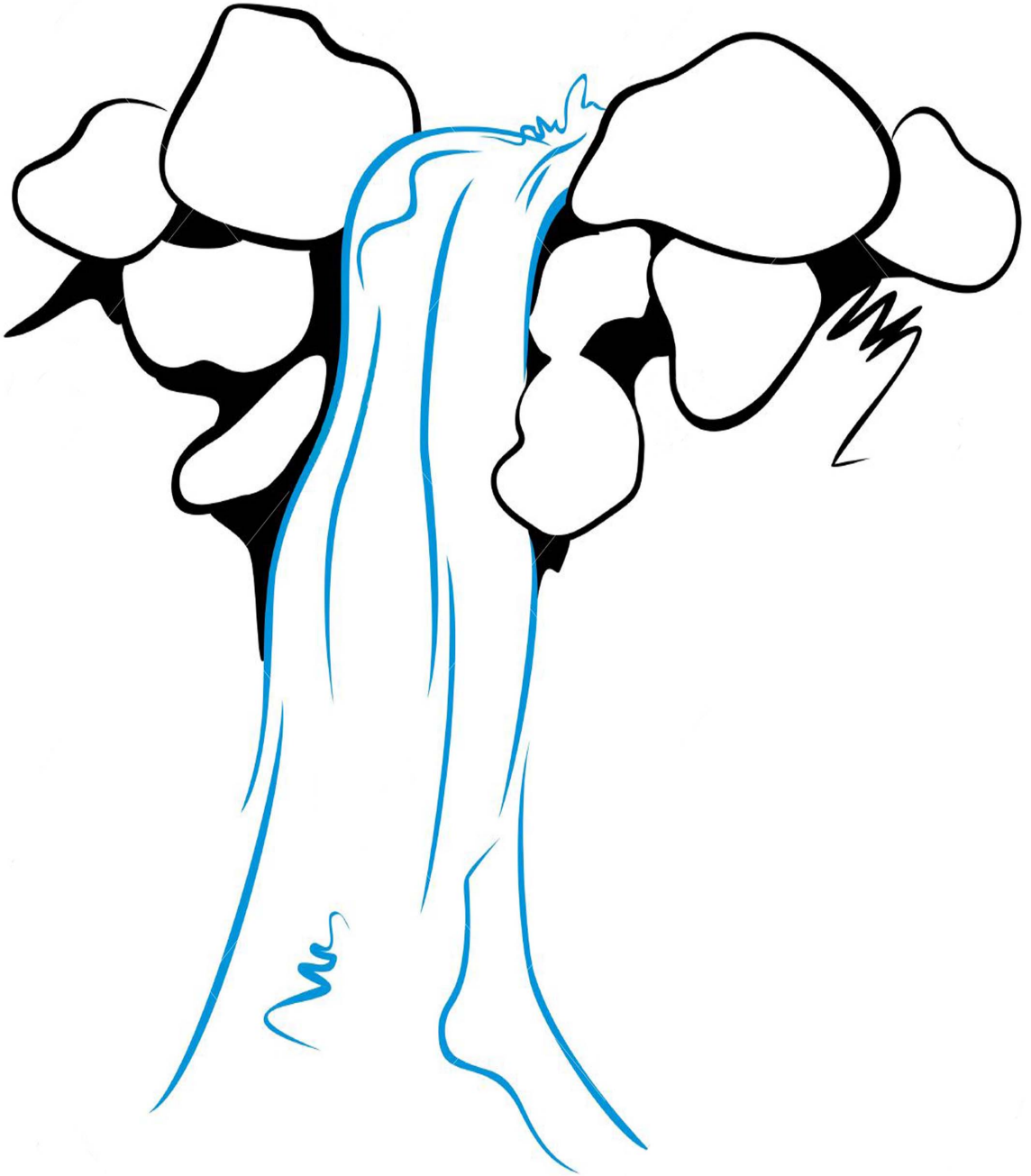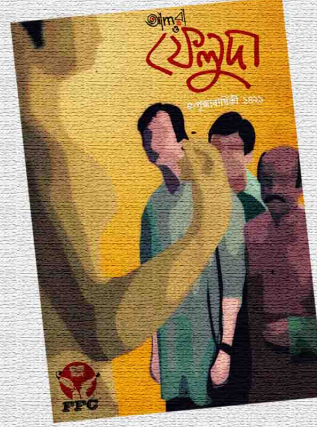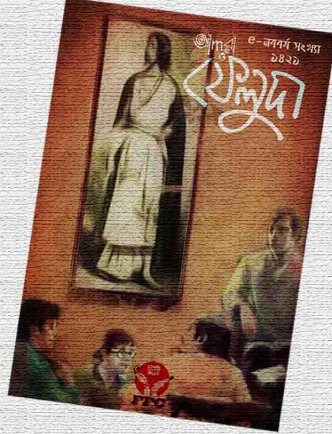
আমরা ও ফেলুদা ই-ম্যাগাজিন এর পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলো পড়ার ও ডাউনলোড করার জন্য নীচের "Click Here" বাটনে ক্লিক করুন অথবা পাশে দেওয়া QR কোডটি স্ক্যান করুন, আর মতামত জানাতে ভুলবেন না যেন

Click Here

OR

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

https://www.facebook.com/groups/feluda.3musketeres/

চাই না ভণ্ড ভক্তি

সায়নদীপ চ্যাটার্জী

আমার দুর্গা শুধু নয় হে দক্ষ হিমের কন্যা,
মহামায়া সে লক্ষ নারীর চোখে অগ্নির বন্যা।
এই প্রজন্মের পুরুষ মোরা নারীদের ডাকি "মাল",
অথচ এই নারীর দেহই জন্ম তরীর পাল।
আমার দুর্গা দশমাস ধরে একটি প্রাণকে বহে,
তার দশদিন পরে কুঁকড়ে প্রসবের ব্যাথা সহে।
সন্তান কোলে হাসে দুর্গা সৃষ্টির উল্লাসে।
পুরুষ-সমাজে জীবন তার দীর্ঘনিঃশ্বাসে।
ঘৃণা ধরে নিজ সত্তার ওপর কেমন পুরুষ মোরা?
নারী জাতিকে বস্তু ভাবি, বিবেক মোদের পোড়া।
আয় রে দুর্গা পোড়া বিবেকের ছাই মেখে নে অঙ্গে,
নারীশক্তির ত্রিনয়ন খোল তোর ওই ভুরুভঙ্গে।
জবার মালা পরাবো তোকে, হাতে নে মা খড়্গ,
ক্রোধাগ্নিতে পোড়া জগত, শ্মশানই যে তোর স্বর্গ।
চণ্ডালরুপী ভোলার সাথে শ্মশানে চণ্ডালিনী,
ক্ষেপী এবার ক্ষেপে যে তুই কুলকুণ্ডলিনী।
কালো কেশ উড়িয়ে দে মা অসীম মহাকাশে,
সভ্যতারই নগ্ন দেহ পোড়াবি চারিপাশে।
অনেক শবের বুকের ওপর নাচবি তখন উমা,
পোড়া জগতের ভস্ম মেখে জেগে উঠবি শ্যামা।
মড়ার খুলিতে রক্তপান করবি সর্বনাশী,
চন্দ্র সূর্য তারারা শুনুক ভীষণ অট্টহাসি।
জবার মালা ছিড়ে তখন গাঁথিস মুণ্ডমালা
পূজার ভান ছেড়ে সবাই বলবে -"পালা পালা"
বলবি তখন চিৎকার করে -"চাই না ভণ্ড ভক্তি
সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস আমি নারী আদ্যা শক্তি।
আমি নই মাতা, না বোন-পুত্রী নেই কোনও বধু বরণে,
পরঃব্রহ্ম মহাকাল যিনি পরে থাকে মোর চরণে"।

জাগৃতি

হ্যাংলা

রাত নামলো, কল্পনা করলাম একটা ডার্ক ভেলভেট!
শুনতে পাচ্ছি আমি, দূরে কোথাও
মন ভোলানোর আসর মেতে উঠেছে!
রেডলাইট বলে ডাকো তোমরা,
আমি বলি নিয়ন্ত্রিত বেদনা।
ঠোঁটে রং, মুখে মিস্টি হাসি,
মধুর মতো পান করে যাও।
অসম্মানের সুখ বলে যায় কেউ কেউ!
কেউবা দাম দেয় ব্যার্থতা ভুলিয়ে দেওয়ার!
রেডলাইট? সে জ্বলতেই থাকে!
তার মিথ্যে হাসির পর্দা ভেদ করে দেখো কোনদিন;
দেখতে পাবে, প্রগতি এখনো
ভাত ঘুম দিতে পারেনি তাদের!
বেশ্যা বলেই ডাকি তোমাদের।
তোমরা গড়ে ওঠো;
সূর্য সবার জানলায় দেখা দিক, জানলা খুলে দাও।
এবার হাসো সত্যিকরে।
হে নারীশক্তি, এবার জাগো বেশ্যা ঘরে!!

(সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত)

ফেলুদা ফ্যান ক্লাব

Join Us

https://fb.com/groups/feluda.3musketeres

FELUDA FAN CLUB: FFC

https://fb.com/feludafanclub

Amra o Feluda: e-magazine

https://fb.com/amraofeluda.ffc

Follow Us

https://twitter.com/FeludaFanClub

Contact Us

feludafanclub.01@gmail.com